৩৬ বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়	জসীমউদ্দিন	৩
পাহাড়ে আগুন	প্রদীপ চক্রবর্তী	৫
চিকিৎসা নৈতিকতা	গৌতম মিস্ত্রি	৭
জলাভূমির ইতিকথা	ধ্রুবা দাশগুপ্ত	১৪
পুরনো সেই জলের কথা	ভূপতি চক্রবর্তী	১৯
বিশ্বাসে মিলায়	সুব্রত ঘোষ	২২
সংগঠন সংবাদ	---	২৮
পরিবেশ নিয়ে যুগলবন্দী	ভবেশ দাস	২৯

সম্পাদক
সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিসঃ বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪
কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬
ফোনঃ ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইটঃ www.utsamanush.com
ইমেলঃ utsamanush1980@gmail.com

আমাদের কথা

মাদার টেরিজা সন্ত হলেন। আমাদের গর্বের অন্ত রইল না। তাঁর দৌলতেই তো গোটা বিশ্ব কলকাতাকে (আর্তনগরী হিসাবে) চিনেছে। তাঁর সন্তপ্রাপ্তি অনুষ্ঠানে 'আমরা কলকাতার লোক' বলে অনেককে সগর্ব ঘোরাঘুরিও করতে দেখেছি। এই প্রসঙ্গে বেশি না ঢুকলেও সন্তপ্রাপ্তি নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন উঠছেই। সবাই বলে, মাদার সারা জীবন নিঃস্বার্থ ও অক্লান্তভাবে আর্তের সেবা করেছেন! কিন্তু মজার কথা, তিনি সেই সেবাকাজের জন্য সন্ত হলেন না। হলেন, খান দুই অলৌকিক কাণ্ডের জন্য। আর দুটিই রোগবালাই সংক্রান্ত। যদিও সেই নিরাময় নিয়ে বিস্তর ধন্দ রয়েছে। লক্ষণীয়, এই একবিংশ শতকেও ৯৯ শতাংশ অলৌকিক ঘটনা ঘটে চিকিৎসা বিষয়েই। সম্ভবত ভগবানবাবু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তা না হলে, এই সন্তকামীরা তো অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে মহাভূকম্প, জলোচ্ছ্বাস বা মহামারী ঠেকিয়া বহু সংখ্যক মানুষকে বাঁচাতে পারেন! তা করেন না। দু-একজনের রোগ সারানোর মধ্যেই অলৌকিক মহিমা সীমাবদ্ধ রাখেন। পোড়াকপাল চিকিৎসকদের, চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের। কত মানুষকে প্রতিদিন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন, টিকা-ওষুধ আবিষ্কার করে হাজার হাজার প্রাণ বাঁচান। ঐশ্বরিক সেন্ট কেন তাঁদের পার্থিব সেন্টও (পয়সা বা সুগন্ধী) জোটে না!

বাঙালি মুক্তকচ্ছ হয়ে শারদোৎসবে মেতে ওঠার আগে ২৬ সেপ্টেম্বর 'এই সময়' সংবাদপত্রে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। শিরোনাম 'পুরোহিত প্রশিক্ষণে ভিড় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদেরও'। এতদিন এক বিশেষ শ্রেণীর লোকই পুজো-আচ্চা করতেন, কম-বেশি শাস্ত্র পড়তেন, তাঁদের বামুন বা একটু ভক্তি মিশিয়ে ঠাকুরমশাই বলা হত। এই প্রজাতি লুপ্তপ্রায়। অথচ প্রশাসনিক বদান্যতায় পুজোর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। সামলাবে কে! অতএব 'পুরোহিত প্রশিক্ষণ' চালু হয়েছে। সেখানে অন্যদের সঙ্গে পিলপিল করে ধেয়ে যাচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, গণিতের শিক্ষক থেকে কম্পিউটার বিষেযজ্ঞরা। তাঁদেরই একজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক সুজয় মুখোপাধ্যায়। তিনি গত দু বছর ধরে পুরোহিত প্রশিক্ষণ শিবিরে যাচ্ছেন। কেন? তাঁর যুক্তি– 'আমাদের বাড়িতে পুজোআচ্চার ভালই চল। দাদুকে দেখতাম নিয়মিত পুজো

করতে। সেই থেকে পুজোর বিজ্ঞানটা জানার আগ্রহ তৈরি হয়। এর প্রত্যেকটা আচারের সঙ্গে শাস্ত্রের সম্পর্ক, যার পিছনে কোনো না কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।' শুনে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটার কথা মনে পড়ে গেল—

কহেন বোঝায়ে কথাটি সোজা এ হিন্দুধর্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি আর শুধু পদার্থ তত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা ম্যাগ্নেটিজম শক্তি
তিলক রেখায় বৈদ্যুৎ ধায় তাই জেগে ওঠে ভক্তি।

গণিতের শিক্ষক অর্ক চট্টোপাধ্যায় ২০০৭ সাল থেকে শিবিরে যান। তাঁর কথায়, 'এখানে জেনেছি ক্ষুধার আগুন যেখানে জ্বলে, তাকেই অগ্ন্যাশয় বলা হয়। এভাবে কত না জিনিস যে জানা হয়ে গিয়েছে। সে জন্যই এই কর্মশালা আমাকে টানে।' এই দৌড়ঝাঁপ না করে অর্কবাবু অভিধান নাড়াচাড়া করতে পারতেন। আগুন জ্বালা বা রক্ষা করার ঘর বা স্থানকে 'অগ্ন্যালয়' বলে। অগ্ন্যাশয় অর্থও তাই।

সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশ, পাস করার পর চিকিৎসকেরা গ্রামে যেতে ইচ্ছুক নন। এ জন্য তাঁদের আর্থিক গুনাগার দিতে হবে। তাতেও পিছুপা নন। ঠিকই তো, এখন ডাক্তারি পড়াতে আর মেধার দরকার পড়ে না, বাপের বিস্তর টাকা থাকলেই চলে। বিশ-তিরিশ লাখ খরচ করে ডাক্তার হয়ে গ্রামে গিয়ে কটা চাষাভুষোর চিকিৎসা করলে আর দেখতে হবে না। বিনিয়োগের টাকা তুলতে কয়েক জন্ম কেটে যাবে। তার চেয়ে শহরের এক ঝাঁ-চকচকে বেসরকারি হাসপাতালে সেঁদিয়ে যেতে পারলেই কেল্লা ফতে। রোগী, প্যাথলজিক্যাল ল্যাব, ওষুধ কোম্পানি— সবার দু হাত তুলে করা আশীর্বাদে এক-দু বছরের মধ্যেই উঠে আসবে টাকা। ব্যবসার লাভ-ক্ষতি হিসেব না করে কেউই এখন বিনিয়োগ করতে চায় না।

সাপে-কাটা মানুষের চিকিৎসায় গ্রামের ওঝাদের তালিম দিয়ে শরিক করার প্রস্তাব একসময় উৎস মানুষ দিয়েছিল। সম্প্রতি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজির অভিজিৎ ভট্টাচার্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের জিষ্ণু দাস, এসএসকেএমের পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরি ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেশমান হুসাম এক সমীক্ষা চালিয়ে জানিয়েছেন, গ্রামে যেহেতু ডাক্তারের অভাব, হাতুড়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আপাতত কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতুড়েদের ইনফর্মাল মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার বা আইএমপি বলা হচ্ছে। এঁদের দিয়ে ৫৪ শতাংশ শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব, জানিয়েছে সমীক্ষা। প্রকাশিত হয়েছে সায়েন্স জার্নালে, অক্টোবরের প্রথম শুক্রবার।

আমরা সবাই যখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ঝুটঝামেলা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা পছন্দ করি, কিছু কিছু লোকের ভেতর কিসের তাগিদ কাজ করে কে জানে! যেমন ভূপেন্দ্র বীরা। রেজ্জাক খাঁ ও তাঁর পুত্র আমজাদ দিব্যি বেআইনিভাবে জমি হাতিয়ে নির্মাণ ব্যবসা ফাঁদছিল। তথ্যের অধিকার আইনে তা ফাঁস করে দিচ্ছিলেন ভূপেন্দ্র। বাড়া ভাতে ছাই পড়ায় স্বাভাবিকভাবে জমিমাফিয়াদের রোষে পড়েন। খুন হয়ে যান। মুম্বইয়ের ঘটনা। বোঝা যাচ্ছে, সামাজিক অবক্ষয় যতই হোক, ভূপেন্দ্ররা থাকবেনই।

হুমায়ুন আজাদ বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক। জার্মানিতে তাঁর রহস্যমৃত্যু ঘটে। পুত্র অনন্য আজাদ বাংলাদেশের ব্লগার। নাস্তিকতার প্রচার করেন। বাংলাদেশের ৮৪জন নাস্তিক ব্লগার আছেন ধর্মান্ধদের খতম-তালিকায়। প্রাণ বাঁচাতে অনন্য জার্মানির হামবুর্গে গত ১৬ মাস গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে দেশে গিয়েও তাঁর বাবা মৃত্যু এড়াতে পারেননি। তাই অনন্য ঝুঁকি না নিয়ে সপরিবার চলে এলেন কলকাতায়। ধর্মান্ধ জঙ্গিদের হাত ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। আগে অশিক্ষিতরা যোগ দিত। এখন শিক্ষিত ঝকঝকে ছেলেমেয়েরাও যোগ দিচ্ছে। সংস্কৃতির শহর কলকাতাও অনন্যদের জন্য কতদিন নিরাপদ থাকবে কে জানে!

এবার আসা যাক নিজেদের কথায়। সত্তরের দিনবদলের স্বপ্ন তখন থিতিয়ে গিয়েছে। অন্যভাবে সমাজকে কিছুটা বদলাতে, কুসংস্কার তাড়িয়ে মানুষকে যুক্তিনিষ্ঠ করে তুলতে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন 'উৎস মানুষ'। পত্রিকা বৃত্তের বাইরে গিয়ে যা এক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। বন্ধুরা মহোত্তর কাজে এক-এক করে সরে যান। আমৃত্যু লড়ে গিয়েছেন অশোক। আমরা তাঁর কাজের খেই ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। 'পুরনো বন্ধুদের' অনেকে ফাঁক পেলেই নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচার চলিয়ে যাচ্ছেন 'পত্রিকা কবে উঠে গিয়েছে!' যদিও সেই ২০০৯ থেকেই তিন মাস অন্তর প্রকাশ হচ্ছে পত্রিকা। বইপত্র ছাপা, বইমেলায় যোগদান চলছে। এবার নতুন করে ছাপা হতে চলেছে 'বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ'। প্রতি বছর অশোকের স্মৃতিতে আয়োজিত হচ্ছে স্মারক বক্তৃতা। এবারের বক্তা বিশিষ্ট পরিবেশবিজ্ঞানী ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ। চলে আসুন সবাই।

আহরণ

ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়

জসীমউদ্দিন

সেই সভায় আমি খুব অভিমানের সঙ্গেই বলিয়াছিলাম, ''আজ বন্দে মাতরম্ গান নিয়ে আমাদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বিরোধের উপক্রম হয়েছে। কখন যে এই বিরোধ অগ্নি-দাহনে জ্বলে ওঠে, কেউ বলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই গান নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। কবি এ কথা স্বীকার করেছিলেন, বন্দে মাতরম্ গানে আপত্তি করবার মুসলমানদের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আজ জাতি যখন এই ব্যাপার নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, তখন কবি কেন নীরব আছেন? তিনি কেন তাঁর মতামত ব্যক্ত করছেন না?

রবীন্দ্রনাথ আমাকে দেখিলেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, ''দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিলেই যে ঘরে আগুন লাগে তার কারণ সেই ঘরের মধ্যে বহুকাল আগুন সঞ্চিত ছিল। যাঁরা বলতে চান, আমরা সবাই মিলমিশ হয়ে ছিলুম ভাল, ইংরেজ এসেই আমাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিল, তাঁরা সমস্যাটিকে এড়িয়ে যেতে চান।''

একদিন বন্দে মাতরম্ গানটি লইয়া কবির সঙ্গে আলোচনা হইল। কবি বলিলেন, ''বন্দে মাতরম্ গানটি যে ভাবে আছে, তোমরা মুসলমানেরা এজন্য আপত্তি করতে পার। কারণ এ গানে তোমাদের ধর্মমত ক্ষুণ্ণ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।''

এর পরে বন্দে মাতরম্ গান লইয়া হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে খুব বিরোধ চলিতেছিল। সেই সময়ে কলিকাতা মুসলিম ইন্‌স্টিটিউটে বন্দে মাতরম্ গান লইয়া মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে এক প্রতিবাদ-সভা বসে। সেই সভার কথা শুনিয়া পরলোকগতা শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার সাম্প্রদায়িক মিলনের উপর এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। মুসলমান ছাত্রেরা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করে এবং তাহাদের প্রতিবাদের বিষয়টিও তাঁহাকে বুঝাইয়া বলে। সেই সভায় আমি খুব অভিমানের সঙ্গেই বলিয়াছিলাম, ''আজ বন্দে মাতরম্ গান নিয়ে আমাদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বিরোধের উপক্রম হয়েছে। কখন যে এই বিরোধ অগ্নি-দাহনে জ্বলে ওঠে, কেউ বলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই গান নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। কবি এ কথা স্বীকার করেছিলেন, বন্দে মাতরম্ গানে আপত্তি করবার মুসলমানদের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আজ জাতি যখন এই ব্যাপার নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, তখন কবি কেন নীরব আছেন? তিনি কেন তাঁর মতামত ব্যক্ত করছেন না?''

আমার বক্তৃতার এই অংশটি কোন পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া উহার সম্পাদক আমাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া প্রমাণ

করিতে ও রবীন্দ্রনাথের বিরাগ ভাজন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইহার অল্প দিন পরে কলিকাতায় যখন সর্বভারতীয় জাতীয় মহাসভার কার্যকরী সমিতির অধিবেশন বসে, তখন বন্দে মাতরম্ গান লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়। সেই সময়ে একদিন বন্ধুবর সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলিলাম, ''রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন, বন্দে মাতরম গানে মুসলমানদের আপত্তির কারণ আছে। আজ সারা দেশ এই গান নিয়ে একটা বিরাট সাম্প্রদায়িক কলহের সম্মুখীন হচ্ছে, এখন তো কবি একটি কথাও বলছেন না।'' সৌম্যেন্দ্রনাথ বলিলেন, ''জহরলাল নেহেরু গানটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কবির পরামর্শের ফলে এ গানে তোমাদের আপত্তিজনক অংশটি কংগ্রেসের কোন অনুষ্ঠানে আর গীত হবে না।''

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পর কবি কিছুদিন অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই অসুস্থ অবস্থার মধ্যেই কবি শিল্পীদলের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। এই অভিনন্দন-সভা ঠাকুরবাড়ির হলঘরে বসিয়াছিল। সেই সভায় নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীরা প্রত্যেকে কবিকে এক একখানা করিয়া চিত্র উপহার দিয়াছিলেন। উহার পরে কিছুদিনের জন্য কবি আর কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই। এই সময়ে আমি প্রায়ই কবির সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমাকে দেখিলেই কবি সাম্প্রদায়িক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, ''কেন যে মানুষ একের অপরাধের জন্য অপরকে মারে! ও-দেশের মুসলমানেরা হিন্দুদের মারল, তাই এদেশের হিন্দুরা এখানকার নিরীহ মুসলমানদের মেরে তার প্রতিবাদ করবে এই বর্বর মনোবৃত্তির হাত থেকে দেশ কি ভাবে উদ্ধার পাবে বলতে পার? দেখ, কী সামান্য ব্যাপার নিয়ে মারামারি হয়। গরু-কোরবানী নিয়ে, মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে। একটা পশুকে রক্ষা করে তো কত মানুষকে মানুষ হত্যা করছে।''

এই সব আলোচনা করিতে কবি মাঝে মাঝে বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। একদিন আমি কবির সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি, কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ আমাকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, ''এখন বাবার শরীর অসুস্থ। আপনাকে দেখলেই তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়া আলোচনা করেন। তাতে মাঝে মাঝে বড়ই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অসুস্থ শরীরে এই উত্তেজনা খুবই ক্ষতিকর। আপনি কিছুদিন বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না।''

আমি তখনকার মত কবির সঙ্গে দেখা করিলাম না।

মুসলমানদের প্রতি কবির মনে কিছু ভুল ধারণা ছিল। তিনি সাধারণত হিন্দু পত্রিকাগুলিই পড়িতেন। মুসলমানী পত্রিকার এক-আধ টুকরা মাঝে মাঝে কবির হাতে পড়িত। কবির ভুল ধারণার প্রতিবাদ করিয়া উপযুক্ত কারণ দেখাইলেই কবি তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া লইতেন। কবির মনে একদেশদর্শী হিন্দুত্বের স্থান ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা স্বাধীন মতবাদ লইয়া ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করিতেন, তাঁহাদের প্রতি কবির মনে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহাদের বিষয়ে কবির পক্ষে বেশী কিছু অনুসন্ধান করা সম্ভব ছিল না। কবির নিকটে যাঁহারা আসিতেন, কবি শুধু তাঁহাদিগকেই জানিতেন। এই বয়সে ইহার বেশী খবরাখবর লওয়া কবির পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

প্রকাশক ঃ গ্রন্থপ্রকাশ

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মারক বক্তৃতা- ২০১৬

বক্তা: **ডঃ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ**

বিষয়: **উবুন্তু: আমরা আছি তাই আমি আছি।**

২৬ নভেম্বর ২০১৬ (শনিবার)

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

জীবনানন্দ সভাঘর

সময়: বিকেল ৫.৩০

পাহাড়ে আগুনঃ দায়ী মানুষ, মরবে গাছ!

প্রদীপ চক্রবর্তী

'পাহাড়ে আগুন' সাধারণভাবে কথাটা শুনতে অবাক লাগলেও গত ১০ বছর কর্মসূত্রে উত্তরাখণ্ড রাজ্যে থাকার দৌলতে পাহাড়ের ভয়াবহ আগুন দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে। জঙ্গলের পর জঙ্গল আগুনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মজুত কৃষিজ পণ্য, গবাদি পশু, বসতবাড়ি এবং অবশ্যই মানুষ। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ থেকে শুরু হয়েছে এ বছরের দাবানলের দাপাদাপি পাহাড় জুড়ে। মোট ১৫৯১টি আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে গাড়োয়ালে ৮৬১, কুমায়ুনে ৫১৯ এবং অভয়ারণ্য ও পক্ষীরালয়ে ২১১টি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। মোট ৩, ৪৬৬ হেক্টর বনাঞ্চল আগুনে ছারখার হয়ে গেছে, যার মধ্যে গাড়োয়ালে ১৫২৫.৫৮ হেক্টর, কুমায়ুনে ১২২২ এবং অভয়ারণ্য ও পক্ষীরালয়ে ৭১৮.১৫ হেক্টর এলাকা আগুনে ভস্মীভূত। পাহাড়ি বনাঞ্চলে ভয়াবহ আগুনের ফলস্বরূপ সেই অঞ্চলের জন্তুজানোয়ার আতঙ্কিত হয়ে নেমে এসেছে নিকটবর্তী আমনগড় এলাকায়, যেটি সমতল ক্ষেত্র এবং উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত। প্রাণিসংরক্ষণ দপ্তর এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তিত, কারণ শরণার্থী প্রাণীদের আমনগড় অভয়ারণ্যে বসবাসকারী প্রাণীরা কী চোখে দেখে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব যদি না হয়, তবে সে সময় শরণার্থী প্রাণীরা জঙ্গলে বসবাসকারী পুরনো প্রাণীদের তাড়া খেয়ে জনবসতি অঞ্চলে পৌঁছে যেতে পারে এবং ভয়ঙ্কর পরিণামের জন্ম দিতে পারে।

এখন প্রশ্ন, এ আগুন লাগে কীভাবে। ১৯১১, ২১, ৩০, ৩১, ৩৯, ৪৫, ৫৩, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭২ ও ৯৫ সালে এ অঞ্চলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। এর মধ্যে ১৯২১, ৩০ এবং ৪২ সালের দাবানলের ঘটনা ছিল অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর জেহাদ। কারণ ব্রিটিশ সরকারের বননীতি (Forestry policy) ভারতীয়দের স্বার্থহানি ঘটিয়েছিল এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ তদানীন্তন পাহাড়ী ভারতবাসী ক্ষেভে যন্ত্রণায় পাহাড়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বনের আগুন রূপ নিয়েছিল প্রতিবাদের আগুনে। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, এ বছরে এই ভয়ঙ্কর আগুনের জন্য দায়ী এক শ্রেণীর মানুষই। গাছের পরিত্যক্ত অংশ জ্বালিয়ে দিয়ে বন পরিষ্কার করতে জেনেশুনেই অগ্নিসংযোগ করেন বন দপ্তরের কর্মীরা (স্থানীয় ভাষায় এদের বলে 'জংলাত')। ক্রমে সেই আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং ধ্বংসাত্মক আকার ধারণ করে। কুমায়ুন, গাড়োয়াল হিমালয়ে এক ধরনের গাছ দেখতে পাওয়া যায়, যার নাম চির পাইন। এটি পাইন গাছের একটি প্রজাতি, বৈজ্ঞানিক নাম 'Pinus. roxburghii', উইলিয়াম রক্সবার্গের নামানুসারে এই গাছের এই নামকরণ।

চির পাইনের শুকনো মোচা ও শুকনো শলাকা

উত্তর পাকিস্থান, উত্তর ভারত (জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং সিকিম), নেপাল ও ভুটানে এই 'চির পাইন' বৃক্ষের দেখা মেলে। ২৩০০ মিটার (৭৫০০ ফুট) উচ্চতা পর্যন্ত এই গাছ দেখা যায়। এই গাছ আসবাবপত্র ছাড়াও পাহাড়ে ঘরবাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। গুণমানের দিক থেকে তেমন উন্নত ও টেকসই না হলেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে স্থানীয় মানুষ এর কাঠ ব্যবহার করেন। এই গাছের চামড়ায় এক ধরনের রেজিন পাওয়া যায়, যা রাবার তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এই রেজিনের মধ্যে থাকে ট্যাক্সিফোলিন নামক এক রাসায়নিক, যা সহজেই জ্বলে উঠতে পারে (Easy to ignite)।

স্থানীয় মানুষ এই গাছের কাঠকে বলে 'ঝুকতি'। এছাড়াও প্রত্যেক শরতে পাইন গাছ থেকে শুকনো শলাকা (dried needles) বর্জিত হয়, যা জমিতে পড়ে থাকা অবস্থায় ঘন কার্পেটের মতো মনে হয়। এ থেকে ঝাঁটা তৈরি হয়, গবাদি পশুর বিছানা তৈরিতেও কাজে লাগে। এই বৃক্ষ শলাকাও সহজ দাহ্য। মুহূর্তের অগ্নিসংযোগে ভয়াবহ রূপ নিতে সক্ষম। ভ্রমণার্থীরা ধূমপানের মৌতাত নিতে নিতে ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের কাঠি ফেললেই কেল্লা ফতে, চির পাইনের পরিত্যক্ত শলাকা মুহূর্তে রূপ নেয় ধ্বংসাত্মক আগুনে। মানুষেরই লাগানো আগুন মানুষেরই নিয়ন্ত্রণ করা

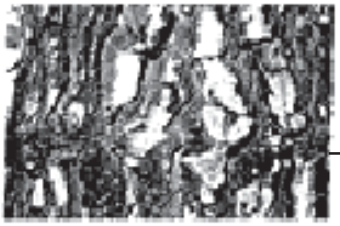

চির পাইন গাছের কাণ্ড

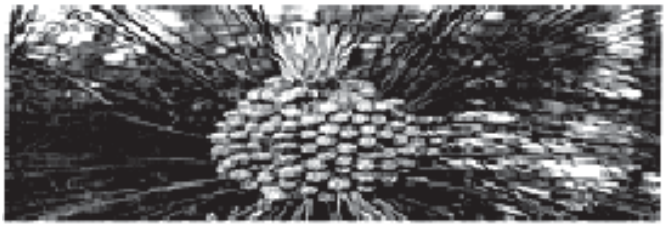

গাছের মোচা (পুং)

মোচা (স্ত্রী)

শলাকা

সভ্যতাকে ছারখার করে দিতে উদ্যত হয়। প্রচণ্ড তাপমাত্রায় গাছের শুকনো অংশের ঘর্ষণের ফলে আগুন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে। তাই একথা বলাই যায়– এই দুর্ঘটনার জন্যে মানুষই দায়ী, প্রকৃতি নয়। তবু উত্তরাখণ্ড সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন 'চির পাইন' নামক তথাকথিত 'শত্রু'কে কোতল করার। দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিবেশগত প্রভাবের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কাছে দরবার করেছে, চির পাইন বধের অনুমতির জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার বৃক্ষ নিধনের প্রস্তাবে সায় দিলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলীর। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, ঐতিহাসিক 'চিপ্‌কো আন্দোলন'-এর পর উত্তরাখণ্ড রাজ্যে গাছকাটা আইনত নিষিদ্ধ।

'ন্যাশনাল ডিজাস্টার ফোর্স' কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের দুর্ঘটনা কবলিত অঞ্চলে উদ্ধারকাজ চালিয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা হেলিকপ্টারের মাধ্যমে 'বাম্বি বাকেট' পদ্ধতির সাহায্যে দুর্গম পাহাড়ি জঙ্গলে আগুন নেভানোর প্রয়াস চালিয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। তবে পুরনো প্রযুক্তি নিয়ে উত্তরাখণ্ডের বন পঞ্চায়েত বিভাগ যে অনবদ্য কাজ করেছে, তা সত্যিই ভোলার নয়।

'দ্য ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল (এনজিটি)' উত্তরাখণ্ড সরকারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন এই অভিযোগে যে, সরকারের রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে অগ্নিনির্বাপণ কার্যের জন্য যতটা উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল, ততখানি উদ্যোগী হন নি। তবে উত্তরাখণ্ড শিক্ষাদপ্তর 'আগুন নির্বাপণ ব্যবস্থাপনা' সম্পর্কে পাঠ্যক্রম চালু করতে চলেছেন সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলিতে। যদি এটি ফলপ্রসূ হয়, তবে উত্তরাখণ্ডবাসী তথা সমগ্র দেশবাসীই এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ একমাত্র জনসচেতনতাই পারে পাহাড়ি বনাগ্নির হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে, যেহেতু অগ্নিনির্বাপণের চাইতে অগ্নিসংযোগ না হতে দেওয়াই সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ।

উমা

চিকিৎসা পরিষেবায় নৈতিকতা

গৌতম মিস্ত্রী

যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁরা জানেন, যতই মনপ্রাণ দিয়ে ডাকুন, বিপদে পড়লে ঈশ্বর সরাসরি এসে উদ্ধার করবেন না। তাই তাঁরা ঈশ্বর, আল্লা, গডের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রক্ষাকারী গুরুদেব, মৌলবি, পাদ্রীদের ওপর বেশি ভরসা করেন। কিন্তু মুশকিল হল, এঁরা হাতের নাগালে থাকলেও প্রত্যক্ষ সাহায্যে তেমন দড় নন। বিশেষ করে রোগবালাইয়ে। ভগবানকেই ডাকতে বলে দায় সারেন। ঈশ্বর-বৃত্তের বাইরে আর একজনকে মানুষ ভগবানের পরই স্থান দেয়, কখনওবা একধাপ এগিয়ে সাক্ষাৎ ভগবানই মনে করে, তিনি হলেন চিকিৎসক। ভগবানের মতো ওঁদের কাছেও আমাদের প্রত্যাশা থাকে অনেক। সেরা পরিষেবার পাশাপাশি বিশেষ প্রত্যাশা থাকে নৈতিকতা আর মানবিকতার, যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত হিপোক্র্যাটিসের ভাবনা থেকেই তৈরি। ম্যান ভার্সেস ক্যানসার বইতে 'দ্য ডক্টর অ্যান্ড পেশেন্ট' অধ্যায়ে লেখা হয়েছে, 'The humane ideas expressed in the works of Hippocrates most influenced the formation of the image of a physician and his relations with the patient. One of these ideas in effect stated that the physician-philosopher may likened to God because there are few differences between wisdom and medicine, and all that one searches for to obtain wisdom is known to medicine, namely, contempt for money, conscientiousness, modesty, simplicity in dress, respect, judgement, decisiveness, tidiness, an abundance of ideas, knowledge of everything that is essential for life, etc.'। বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক আন্তন চেকভ পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট চিকিৎসক হতে চাওয়া এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'দ্য প্রফেসন অভ আ ডক্টর ইজ অ্যান এক্সপ্লয়েট হুইচ কলস ফর সেল্‌ফ-অ্যাসারশন, আ পিওরিটি অভ স্পিরিট অ্যান্ড ক্ল্যারিটি অভ ইনটেনশন। ওয়ান মাস্ট বি অভ ব্রাইট ইনটেলিজেন্স, পিওর ইন মরালস অ্যান্ড ফিজিক্যালি টাইডি।' এই সব কারণেই নীচু শ্রেণীর স্কুলপাঠ্য বইতে একটা সময় সমাজবন্ধুদের যে তালিকা থাকত, তাতে স্বাভাবিকভাবেই ওপরের দিকে ঠাঁই পেত ডাক্তারের নাম। এই সমাজবন্ধু মানে, যাঁরা নিজের স্বার্থ অনেকটা ত্যাগ করে, সমাজের তথা মানুষের উপকার করেন। আগে সংখ্যাগুরু চিকিৎসক সত্যিই সমাজবন্ধু ছিলেন। চিকিৎসকেরা নিজেরাও তা মনে করতেন। 'হিপোক্র্যাটিক ওথ' নামে বিশেষ শপথ নিয়ে এবং মেনেই শুরু করতেন চিকিৎসা। 'আরোগ্য নিকেতন' বা 'অগ্নীশ্বর'-এর মতো উপন্যাসে এঁদের কথাই লেখা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা সংখ্যালঘুর দলে। আর্থিক বা অন্য পার্থিব সুবিধার দাসত্ব করতে গিয়ে চিকিৎসকেরা আর নীতি-নৈতিকতার ধার ধারছেন না। যেদিক থেকে পারেন রোগী ও তাঁর পরিজনদের কাছ থেকে খাবলা মারছেন। তাই মৃত মানুষকে ভেন্টিলেটারে রেখে দিয়ে তাঁর বাড়ির লোকের ঘাড় মটকাতে বাধছে না। হতদরিদ্র দেখেও গাদাগুচ্ছের অনাবশ্যক পরীক্ষা করিয়ে তা থেকে কমিশন নিচ্ছেন। ওষুধ কোম্পানির উপঢৌকনের দৌলতে কম দামি ওষুধ থাকলেও গম্ভীর মুখে দামি ওষুধ লিখছেন। তালিকা দীর্ঘ। চিকিৎসক ক্রমশ হয়ে উঠেছেন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। স্বর্গ থেকে তাঁদের পতন ঘটেছে। 'ডাক্তারবাবু বাঁচা-মরা আপনার হাতে'– সাধারণের এই আস্থার পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে অবিশ্বাসেরও। নগদ দিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা কিনছে, তাই পান থেকে চুল খসলে গায়ে হাত তুলতেও বাধছে না। দরদী, মানবিক চিকিৎসকেরাও গোলেমালে অসহায়, বিভ্রান্ত। কেউ বলতে পারেন-- এসবই ভোগবাদী সমাজের ফসল। তবু আমরা স্বপ্ন দেখি আদর্শ দৃশ্যকল্পের। বুঝতে চাই চিকিৎসা পরিষেবা ও নৈতিকতায় গলদ কোথায়।

নীতি থেকে নৈতিকতা নামক গৌরবান্বিত মানবিক গুণের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। আমরা সামাজিক জীব। সামাজিক প্রয়োজনেই বিভিন্ন নেশা আর পেশার লোকেদের সঙ্গে নিত্য লেনদেনের সম্পর্ক। সেই লেনদেন সবসময় নীতিগত হতেও পারে, নাও পারে। প্রাপ্তি আশানুরূপ না হলে, অথবা নীতি মেনে না হলে

সভ্য সামাজিক মানুষ যাতে হিংস্র হয়ে না ওঠে তার জন্যও রীতিনীতি তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ, প্রশাসন, বিচার বিভাগ সামাজিক মানুষের সম্মিলিত অর্থে পুষ্ট হয়ে নিয়মমতে চলতে বাধ্য করে সেই সামাজিক মানুষকেই। তা সত্ত্বেও মানুষে মানুষে লেনদেনে বড়সড় ফাঁকি থেকে যায়। নিয়মের বেড়াজালে আশানুরূপ রাশ টানা যায় না ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রবৃত্তিকে। চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসক বা চিকিৎসা সংস্থা ঠিক কাজটি করলেন বা করল কি না তা বেশ ধোঁয়াশায় ভরা। অনেক ক্ষেত্রেই পরিমাপযোগ্য নয়। রুলবুকের নিয়মে বেঁধে ফেলওা দুষ্কর। চিকিৎসা পরিষেবায় নৈতিকতার আবেদন তাই অসহায় মানুষের শেষ সহায়, এক ধরনের আত্মসমর্পণ।

মনে করুন, আপনার তলপেটে ব্যথা হল। কারণ আমাশাও হতে পারে, আবার অ্যাপেন্ডিসাইটিসও। পেটের ব্যথার কারণ নির্ণয়ের হাজার রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে, কিন্তু নিশ্চিত করে কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের সম্ভাবনা নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাই কোনো অসৎ চিকিৎসক পেটের ব্যথাকে নিশ্চিতভাবে আমাশা বলে জানলেও আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলে রুগীকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে ফেললে তাঁকে ঠেকাবে কোন আইন! অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কেটে নেওয়া অ্যাপেন্ডিক্স প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষায় স্বাভাবিক প্রমাণিত হলে অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশনের মান্যতা অপ্রমাণ করা যায় না।

প্রয়োগমূলক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা আর সততার ওপর চিকিৎসা পরিষেবা অসহায়ভাবে নির্ভরশীল। প্রশিক্ষণ আর অভিজ্ঞতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে বাধ্য, আবার প্রতিটি অসুস্থতা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়েই চিকিৎসককে চ্যালেঞ্জ জানায়। চিকিৎসা পরিষেবার সেই ধোঁয়াশায় ভরা অনিশ্চিত পরিণতির চোরা স্রোতে চিকিৎসকের সততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসকের ও চিকিৎসা সংস্থার সেই সততা মাপা দুষ্কর; নিয়মের বেড়াজালে সততাকে বেঁধে ফেলার প্রচেষ্টা বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো বলেই প্রতীয়মান হয়।

সচেতন অথবা অবচেতনভাবে প্রতিটি মানুষের প্রতিটি কাজকর্ম আপন নৈতিকতাবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পশ্চিমী দর্শনে নৈতিকতার তিনটি স্তরের বর্ণনা পাওয়া যায়। অ্যারিস্টটলের দার্শনিক চেতনায় ব্যক্তিমানুষের সুবিচার করতে চাওয়ার বৈশিষ্ট্য -- পরোপকার করার ইচ্ছা, স্বেচ্ছাসেবা আর উদারতা (justice, charity and generosity), নিজেকে আর তার চারপাশের অন্যদের পুষ্ট করতে থাকে। জার্মান দার্শনিক কান্টের মতে, কর্তব্যপরায়ণতাই হল নৈতিকতার মূল চালিকাশক্তি। যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ, অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে তার পরিমণ্ডলের অন্যান্য অস্তিত্বের প্রতি সম্মান দেখাতে বাধ্য হয়। ইউটিলিটারিজম দর্শনে নৈতিকতায় আবদ্ধ মানুষের চরম আনন্দপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। নৈতিকতার এই গুণগুলো মেনে নিলেও এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, প্রতিটি মানুষের মতো আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ ও নৈতিকতার একটা বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বের অন্তিম শক্তি চিকিৎসকদের কর্মকাণ্ডকেও নির্ধারণ করে। অসৎ চিকিৎসক ও চিকিৎসা সংস্থার কুকীর্তির উদাহরণের অভাব নেই। অপ্রয়োজনে করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, মামুলি কোমরের ব্যথায় এমআরআই পরীক্ষা, যে কোনো বুকের ব্যথায় ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি রেখে বেসরকারি হাসপাতালের কোষাগারের স্বার্থরক্ষা, সর্দি-জ্বরে গাদা গাদা রক্তপরীক্ষা ইত্যাদি। অনৈতিকতার দায় কেবল এককভাবে চিকিৎসকের ওপর বর্তায় না। কর্মজীবনের শুরুর দিকে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে কাজ করার সময় অনুভব করেছি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সবসময়ের জন্য একটা চাপ থাকে ঐ হাসপাতালের কৃপাধন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের ওপরে। ন্যূনতম সংখ্যায় রোগীভর্তি করার একটা লক্ষ্যমাত্রা বা ন্যূনতম অঙ্কের ব্যবসা স্থির করে দেওয়া হয়। এর বিনিময়ে ঐ ডাক্তার হাসপাতালের প্রোমোশনাল পরিষেবা পেয়ে থাকেন, চিকিৎসা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার প্রয়োজনীয় চামড়া বাঁচানোর নিরাপত্তার ছত্রছায়া উপভোগ করেন ও তাঁর নিজস্ব প্রাইভেট প্র্যাকটিসের পরিসরে হাসপাতালের গরিমার তকমা এঁটে নিজের পসার বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন। ডাক্তারের নৈতিক দায়বদ্ধতা রুগী ছেড়ে হাসপাতালের ক্যাশবাক্সের অভিমুখে দিক বদলায়। ছোট বড় ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো রুগীর রোগনির্ণয়ের পরীক্ষার দামের এক অংশ 'লয়ালটি মানি' বা 'কাট মানি' হিসাবে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দেয়। যে ডায়াগনস্টিক সেন্টার যত অপরিচিত, তত বিশাল তার কৃতজ্ঞতার নিবেদন অর্থাৎ বড় হিস্‌সা। এই হিস্‌সা নিয়ে রীতিমতো দর কষাকষি করেন ডাক্তার। প্রতিযোগিতায়

মাতে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো। এই হিস্সার অংশ মাঝে মাঝে ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ রক্তের শর্করা পরীক্ষার জন্য রুগী ৫০ টাকা দিলে তার থেকে মাত্র ২৫ টাকা ল্যাবরেটরির কাছে পড়ে থাকে। এই ২৫ টাকায় রক্তের সুগার পরীক্ষার রিএজেন্টের দাম ও আনুষঙ্গিক খরচ করে ল্যাবরেটরিকে লাভও করতে হয়। সেই পরীক্ষার মান (যদি আদৌ পরীক্ষা করা হয়) অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। রক্ত, প্রস্রাব ইত্যাদি পরীক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরীক্ষাটি আদৌ করা হয়েছে কি না, অর্থাৎ পরীক্ষা না করে কেবল অনুমান সাপেক্ষে ফল ছেপে দিচ্ছে কি না সেটি নিশ্চিত করে বোঝার উপায় নেই। এক্সরে বা ইসিজি-র ক্ষেত্রে তবু একটা ছবি বা রেখাচিত্র রিপোর্টের সঙ্গে পাওয়া যায়। ছেপে দেওয়া রক্তের রিপোর্ট বিশ্বাস করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। 'সিঙ্ক টেস্ট' বলে একটা শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় অভিধানে, যার অর্থ অনৈতিকভাবে রক্ত, প্রস্রাব ও অন্যান্য সমগোত্রীয় পরীক্ষার নমুনা সিঙ্কে ফেলে দিয়ে মনগড়া রিপোর্ট ছেপে দেওয়া। ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টে অবিশ্বাস দানা বাঁধলেও সেটা প্রমাণ করার উপায় নেই। একই সঙ্গে একাধিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে রিপোর্টে বিস্তর ফারাক পাওয়া গেলেও দুষ্ট ল্যাবরেটরিকে আইনের শাসনে ধরা যাবে না। কারণ রক্তের পরীক্ষার রিপোর্ট সময়ের ব্যবধানে পালটে যেতেই পারে অথবা কোনো বিশেষ ল্যাবরেটরির রিপোর্ট অভ্রান্ত বলে আইনি মান্যতা পায় না। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমন অনেক অস্বচ্ছ ক্ষেত্র (গ্রে জোন) আছে, যেগুলোর সত্যতা নিয়ে আইনি বিতর্কে বিচারালয় সাধারণত 'এক্সপার্ট ওপিনিয়ন'-এর ওপরে অসহায়ভাবে নির্ভর করে। সব চিকিৎসা কুকীর্তিই কেবল অসততার কারণে সংঘটিত হয় না। বেশ কিছু চিকিৎসকের অজ্ঞানতার কারণেও ঘটে থাকে। যেমন আন্ত্রিক রোগে অ্যান্টিবায়োটিক, ইরিটেব্‌ল বাওয়েল সিন্ড্রোমে প্যান্টোপ্রাজোলের ব্যবহার।

নৈতিকতার আবেদন অসততার গন্ডির বাইরেও ব্যাপ্ত। সুচিকিৎসা বলতে চিকিৎসকের কাছে সততা ছাড়াও নৈতিকতার আরও কিছু অনুষঙ্গ দাবি করে থাকে। এর মধ্যে 'বৃথা চিকিৎসা' অন্যতম। সততার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়েও নীতি অভিভাবককে কীরকম বুড়ো আঙুল দেখানো যায় তার একটা নমুনা বিশ্লেষণ করা যাক। মনে করুন, আমার বা আপনার অতি প্রিয়জন, ৭০ বছরের এক প্রবীণ বেশ উঁচুমানের নামকরা এক হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। কৃত্রিম শ্বসনযন্ত্র (ভেন্টিলেটার) বুকের মধ্যে অক্সিজেন পাম্প করে যাচ্ছে। একদিন অন্তর ডায়ালিসিস করতে হচ্ছে, কারণ দীর্ঘমেয়াদি ডায়াবেটিস রোগে কিডনি পাকাপাকিভাবে অকেজো। রক্তে সংক্রমণ হয়েছে, ফলে সবচেয়ে শক্তিশালী তিন-তিনটি অ্যান্টিবায়োটিক শিরা দিয়ে ঢুকে রেজিস্ট্যান্ট রোগজীবাণুর সঙ্গে এক হেরে যাওয়া লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারের মুখ পরাজিত সেনাপতির মতো, রোগীর আত্মীয়পরিজন রোগীর সুস্থতার বিষয়ে যতটা সন্দিহান তার চেয়ে বেশি আর্থিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত। এই কর্মকাণ্ডে প্রথাগত অনৈতিকতার আভাস পাওয়া যাবে না। এই ধরনের চিকিৎসা যতই দীর্ঘায়িত হবে, আমি আপনি ততই এক দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকব। রোগশয্যায় শায়িত মানুষটি এইসব বোধের অতীত। আমি বা আপনি কোনোরকম ম্যাজিকের প্রত্যাশী নই। কেবল অন্তরালে হাসছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ডাক্তারও বুঝি আমার আপনার আড়ালে হাসছেন। এমন অবস্থায় রোগীর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরাটা একরকম অসম্ভব। আধুনিক চিকিৎসা কিন্তু এইরকম জীবন-মরণের মাঝখানে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রোগীকে জিইয়ে রাখতে সক্ষম অনেকদিন ধরে। এমন অবস্থায় ইউথেনাসিয়া বা স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা আলোচিত হয়। সেই বিতর্কের সন্তোষজনক শেষ উত্তর এখনও মেলে নি। প্রথাগতভাবে অনৈতিকও নয় আবার কাঙ্ক্ষিতও নয়, চিকিৎসার এই অবতারকে 'বৃথা চিকিৎসা বা মেডিকেল ফিউটিলিটি' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। পশ্চিমী চিকিৎসার জনক হিপোক্র্যাটিস বলে গিছেন, 'সাঙ্ঘাতিক রকমের দুরারোগ্য রোগীদের কেবল কষ্ট লাঘবের চিকিৎসাই করা উচিত।' বৃথা চিকিৎসার অসারতা উপলব্ধি করার অভাবই আধুনিক যুগের অনৈতিক চিকিৎসার নয়া প্রহসন। বিতর্ক তখনই দানা বাঁধে, যখন রোগী অথবা রোগীর আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের বিশেষ চিকিৎসার সম্ভাব্য সাফল্য নিয়ে মতানৈক্য হয়। নতুন নতুন চিকিৎসা প্রযুক্তির আবির্ভাবের কোনো শেষ নেই। সবসময় তাদের সাফল্যের কথাও জানা সম্ভব হয় না। যেমন জানা হয় না তাদের সমস্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা। উন্নত জেনারেশনের ডায়ালিসিস, ভেন্টিলেটার, কৃত্রিম হৃদযন্ত্র, হৃদপিণ্ডের পাম্পের কাজে সাহায্যকারী অতিরিক্ত যন্ত্র, রক্তসংবাহী শিরায় খাদ্যের বিকল্প পুষ্টি ইনফিউশন ইত্যাদি আজকাল অর্ধমৃত মানুষকে

দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এটা তিন দশক আগেও ভাবা যেত না। এই অবস্থায় রোগী ও রোগীর আত্মীয় পরিজনদের পক্ষে চিকিৎসা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া একরকম অসম্ভব হয়েই পড়ে। ভগবানস্বরূপ ডাক্তার যেটা বলেন, রোগীর আত্মীয় পরিজন তাতে সায় দিতে বাধ্য হন। মৃত্যু-বিছানায় প্রিয়জনকে দেখে ম্যাজিকের প্রত্যাশী অসহায় মানুষ ঘটি-বাটি বেচে সদ্য আবিষ্কৃত ক্যান্সারের ওষুধের আকাশছোঁয়া মূল্য চোকাতে থাকেন।

মনে করুন, একজন দুরারোগ্য লিভারের ক্যান্সারে আক্রান্ত, জীবনের শেষ লগ্নে তাঁর ফুসফুসে ও রক্তে সংক্রমণ, কিডনি অকেজো। এমন ক্ষেত্রে সে জানে, আপনিও জানেন, তাঁর আয়ুষ্কালের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে। যদিও রোগীর পক্ষে তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটা দিন অতিবাহিত করার কাঙ্ক্ষিত স্থান বাড়ির শয়নকক্ষ। কিন্তু অভ্যেসের বশে, আত্মীয় পরিজনদের কুৎসার ভয়ে, রোগীর অভিভাবক হিসেবে তাঁর ছেলে বা মেয়েদের নিজেদের ছন্দ বিঘ্নিত হবার ভয়ে, নিজের চোখের সামনে শেষ পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে না চাওয়ার জন্য অথবা হয়ত বা কোনো আইনি অসুবিধার জন্য রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতেই হয়। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা এমন ক্ষেত্রে রোগীর পরিজনদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরামর্শই দেন। বেসরকারি হাসপাতাল ব্যবসায়িক কারণেই বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা ভুলেও বলে না। এমন ক্ষেত্রে সহৃদয় কোনো চিকিৎসক ভেন্টিলেটার, ডায়ালিসিস মেশিন, কেমোথেরাপি ইত্যাদি থেকে রোগীকে (তাঁর পরিবারকে) রেহাই দিলে তিনি কুর্নিশ পাওয়ার যোগ্য। তিনি অবশ্য তেমনটি না করলে কোনো আইন বা প্রথাগত নৈতিকতা তাঁকে রক্তচক্ষু দেখাতে পারবে না। এ রকম অবস্থায় চিকিৎসকের নিঃস্বার্থভাবে বিচার করা উচিত, একদিকে জটিল, ব্যয়সাধ্য, কষ্টকর ও প্রায় নিষ্ফল চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করে অন্তিমে রোগী কী পাচ্ছেন? চিকিৎসার পরিমাপযোগ্য প্রচেষ্টার অন্তিমে রোগীর নাকে অক্সিজেনের নল, শিরায় স্যালাইনের জল, বুকে হাপরের ফুঁ আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় চিকিৎসক নার্সের নজরদারি ছাড়া রোগীর আদৌ স্বাভাবিক উপভোগ্য জীবন লাভ সম্ভব হচ্ছে কি না। বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে কালেভদ্রে কোনো এক অচিন দেশে লক্ষ কোটি এমনধারা রোগীর মধ্যে ক্বচিৎ কদাচিৎ দুই একজনের রোগমুক্তির কথা যে শোনা যায় না এমনটা নয়। এইজন্যই রোগমুক্তির আশা না থাকলেও চিৎসা বন্ধ করে সসম্মান পরাজয় স্বীকার করে নেওয়ার প্রক্রিয়াটা সোজাসাপটা নয়। এইখানে মানবিক তুল্যমূল্য বিচারের কাজটা চিকিৎসকের গুরুদায়িত্ব। এই ভারসাম্য রক্ষার কাজটা অবশ্যই সুচিকিৎসকের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এটার অভাবকেও অনৈতিক বলা যায় বোধহয়। বর্তমান সময়ে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির মৃত্যু ত্বরান্বিত করায় আইনি সমস্যাও আছে। কিন্তু অহেতুক জটিল অসফল যন্ত্রসর্বস্ব ব্যায়সাধ্য ও রোগীর পক্ষে কষ্টকর বৃথা চিকিৎসার প্রয়োগ করা থেকে সংযত থাকা ও একইসঙ্গে রোগী ও তার উৎকণ্ঠিত আত্মীয়পরিজনদের সেটা সংবেদনশীল মন নিয়ে বুঝিয়ে বলা যেতেই পারে। অসফল, জটিল, প্রযুক্তিসর্বস্ব চিকিৎসা প্রযুক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু কাম্য ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তেমনটি হলে চিকিৎসক আর রোগীর আত্মীয়স্বজনদের 'মৃত্যুরোধে অসফল চিকিৎসা প্রযুক্তি' প্রয়োগ না করার জন্য বিবেকের দংশনে ভুগতে হত না।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চিকিৎসাক্ষেত্রে এককভাবে ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত নেবার একচ্ছত্র অধিকারে আঘাত হানল চিকিৎসা প্রযুক্তির একাধিক আংশিক সফল উপায়গুলি। এই সময়ের আগে চিকিৎসা করার আগে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসা পদ্ধতির ঝুঁকি আর প্রাপ্তি নিয়ে আলোচনার নৈতিক দায়িত্ব চিকিৎসকের ছিল না। বেশ কিছু চিকিৎসা প্রযুক্তি প্রয়োগের আগে রোগী ও তার নিকট আত্মীয়ের অনুমতি নেওয়াটা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এই অনুমতি নেওয়ার প্রক্রিয়ায় অন্তত নীতিগতভাবে চিকিৎসা পদ্ধতি নির্বাচনে রোগীর পছন্দ অপছন্দকেই মান্যতা দেওয়া হল। আজকাল বহুক্ষেত্রে সর্বাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সফলতা সর্বাত্মকভাবে সংশয়াতীত নয়; বরং চিকিৎসার উপায় একাধিক। সেগুলোর অধিকাংশই আংশিক সফল অথবা সফলতা অনিশ্চিত। এইরকম ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বাড়তি কাজ হয়ে পড়ল প্রয়োগযোগ্য চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিরপেক্ষভাবে রোগীর বোঝার মতন করে ব্যাখ্যা করা ও রোগী কিংবা রোগীর আত্মীয় পরিজনদের সেই একাধিক চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে সাহায্য করা। এইভাবে চিকিৎসা পরিষেবার টাইম-লাইনে 'ইনফরমড কনসেন্ট' অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এই একই সময়ে হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, কিডনি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কাজ অনিরাময়যোগ্যভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লেও ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে মানুষকে দীর্ঘকাল ধরে বাঁচিয়ে রাখার

কৌশল চিকিৎসকদের করায়ত্ত হয়ে গেল। ফলে যে সকল মরণাপন্ন রোগীদের সুস্থ হয়ে জীবনকে স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করার ও কর্মক্ষম হবার সম্ভাবনা নেই এমন রোগীদের কৃত্রিম উপায়ে কোনোক্রমে বাঁচিয়ে রাখার বা না রাখার (চিকিৎসা পরিষেবার লাইফ লাইন বন্ধ করে দিয়ে) বিতর্ক চিকিৎসকদের কাছে এক উত্তর না জানা প্রশ্ন হিসাবে উপস্থিত হল। চিকিৎসক-রোগীর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত সবসময়ই যে কাজের হল এমন নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রাপ্তির অনিশ্চয়তার ফলে রোগীর অস্বাচ্ছন্দ্য, উৎকণ্ঠা ও অমূলক ভীতি ইত্যাদির মানসিক বোঝা ডাক্তারের কাঁধ থেকে কিছুটা রোগী ও তার পরিবারের ওপর ন্যস্ত হল। চিকিৎসা প্রযুক্তির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে এগুলো আগেও ছিল, কিন্তু সেগুলোর দ্বন্দ্বের বোঝা কেবল চিকিৎসকেরই ওপর ন্যস্ত ছিল। 'চিকিৎসক-রোগী সম্মিলিত সিদ্ধান্ত' নেবার প্রথা চালু হবার ফলে অনেক ক্ষেত্রে আগের মতো চিকিৎসক স্বাধীনভাবে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ প্রযুক্তি আর হাত খুলে ব্যবহার করতে পারলেন না। যেমন ধরুন, রোগলক্ষণ বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞ ডাক্তার বুঝে গেলেন, আপনার জ্বরের কারণ ম্যালেরিয়া কিন্তু রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া নির্ণীত হল না। এমন অবস্থায় আনুমানিক ওযুধ প্রয়োগ কাজের ও ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম। ডাক্তার অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে, এমন ক্ষেত্রে গোটা দশেক ক্লোরোকুইনের বড়ি খেলে ম্যালেরিয়া সেরে যাবে। সেটা অনুমান সাপেক্ষ হলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতা চিকিৎসক নিজের কাঁধেই বহন করতেন। কিন্তু এই নতুন বিধির গেরোয় তাঁকে এখন বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে, আপনাকে বোঝাতে হবে আপনার জ্বরের সম্ভাব্য কারণ ম্যালেরিয়া হবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু সেই সম্ভাবনা ১০০ শতাংশ নয় আর ক্লোরোকুইনের বড়ির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে অন্যান্য অবাঞ্ছিত অনুষঙ্গের সঙ্গে হার্টের ওপরেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবার বিরল সম্ভাবনা আছে। রোগীর তথ্য জানার উন্মুক্ত স্বাধীনতার বিপরীতে বিগত প্রজন্মের ডাক্তারের আনুমানিক অভিজ্ঞতা আর বিশ্বাসের এই প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব এখন এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এই খোলা হাওয়ার সুবিধা আর অসুবিধা দুই-ই আছে। চিকিৎসক বুঝলেন, দুরারোগ্য মৃত্যুপথযাত্রী রোগী ভেন্টিলেটর আর ডায়ালিসিসের সাহায্যে বিস্তর অর্থমূল্যে হয়ত আরও বেশ কয়েকটা মাস টিকে থাকতে পারেন, যদিও সেই বাঁচা রোগীর কাছে অর্থহীন আর রোগীর আত্মীয়পরিজনদের কাছে মানসিক যন্ত্রণার আর বিশাল অর্থদণ্ডের সামিল। এমতাবস্থায় সহৃদয় ডাক্তার রোগীদের আত্মীয়পরিজনদের অর্থহীন বৃথা চিকিৎসার বাহুল্য বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারেন। আবার অপর দিকে রোগীর আত্মীয়পরিজন বিত্তবান ও অন্যরকম মানসিকতার হলে (সচেতনভাবে ভাল বা মন্দ বলা থেকে বিরত থাকলাম) তাঁরা সবরকম আধুনিক চিকিৎসা প্রয়োগ করতে চাইতে পারেন। এঁরা অনেক সময়ে সম্ভব হলে অপেক্ষাকৃত উন্নত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জন্যও ডাক্তারদের চাপ দিতে থাকেন। সাধারণত অর্থহীন, বৃথা ও পরীক্ষামূলক চিকিৎসা প্রযুক্তি বাজিয়ে দেখতে এঁরা কসুর করেন না। রোগী অবশ্য এইসব ক্ষেত্রের অধিকাংশ সময়েই অচেতন থাকেন বা ওঁকে এই আলোচনায় অংশ নিতে রোগীর পরিজন ইচ্ছুক থাকেন না। ১৯৮০-র দশকে পশ্চিমী দুনিয়ায় এই ব্যাপারে অনেকে বিতর্ক করেছেন যে, এইরকম ক্ষেত্রে চিকিৎসকের এককভাবে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাকে মান্যতা দেওয়া উচিত (Blackhall Lj. Must we always use CPR? N Eng J Med 1987; 317:1281)

বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে মরণাপন্ন রোগীর যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি দেবার জন্য প্রচুর মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। এমন একটি বিশেষ দ্বন্দ্বময় চিকিৎসার ইতিবৃত্তের কথা ইতিহাস হয়ে আছে। আমেরিকার মিনাসোটা নিবাসী ৮৬ বছরের জনৈকা মহিলা হেলগা ওয়াংলি বাড়িতে পড়ে গিয়ে উরুর হাড় ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হন ১৯৮৯ সালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে একটি নার্সিংহোমে রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য ভর্তি হন। শ্বাসকষ্টের সমস্যার জন্য তাঁকে আবার আগের হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। সেখানে ভেন্টিলেটরের দ্বারা বেশ কয়েক মাস বাঁচিয়ে রাখার পরে চিকিৎসক ও রোগীর আত্মীয়রা বুঝতে পারেন, হেলগা নিজের স্বাভাবিক শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা সম্ভবত চিরতরেই হারিয়ে ফেলেছেন। এই সময়ে তাঁকে আরও বড় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এতদিন পর্যন্ত হেলগা সচেতনভাবেই বেঁচে ছিলেন। এবার ভেন্টিলেটর থেকে তাঁকে স্বাভাবিক শ্বাস নেওয়ার প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হতে লাগল। এইরকম এক চেষ্টার সময়ে তাঁর

হৃদস্পন্দন ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়ে ও রক্তচলাচল সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যাবার কারণে মস্তিষ্কে স্ট্রোক হয়। এবার তিনি চেতনা হারান ও পাকাপাকিভাবে সংজ্ঞাহীন জড় পদার্থের মতো এক অবস্থায় (persistent vegetative state, PVS) পরিণত হন। এরপরে আরও বেশ কয়েক মাস অর্ধমৃত অবস্থাটা ভেন্টিলেটর, নাকের মধ্যে দিয়ে পাকস্থলিতে নল (রাইলস টিউব) ঢুকিয়ে খাবার বন্দোবস্ত ও একের পর এক শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের দ্বারা জিইয়ে রাখার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। তাঁর স্বামী ও সন্তানরা সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারেন, রোগীর সুস্থ হবার সম্ভাবনা নেই। চিকিৎসকমণ্ডলী উপলব্ধি করতে পারেন, এরপরে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ায় রোগীর কোনো স্বার্থসিদ্ধি হবে না। কিন্তু রোগীর আত্মীয়রা বলেন, চিকিৎসকরা যেন ভগবানের ভূমিকা পালন করে চিকিৎসায় গাফিলতি না করেন, কারণ সেটা হবে ধর্মীয় ভাবাবেগের পরিপন্থী। ঘন ঘন আলোচনাচক্র চলতে থাকে রোগীর আত্মীয়স্বজন, গির্জার পাদ্রি ও নীতিনির্ধারক বিশিষ্ট গোষ্ঠীদের সঙ্গে। অবশেষে রোগীর আত্মীয়রা 'হৃদস্পন্দন থেমে গেলে' বাঁচানোর শেষ চেষ্টা না করাতে (do not resuscitate, DND) সম্মত হন। ভেন্টিলেটর সহ অন্যান্য চিকিৎসা আগেরই মতো চলতে থাকে। নিরুৎসাহে আবিষ্ট চিকিৎসকেরা রোগীর আত্মীয়দের কোর্ট থেকে চিকিৎসা চালিয়ে যাবার আদেশ আনতে বলেন। তাতে রাজি না হওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্ব-উদ্যোগে কোর্টে চিকিৎসা বন্ধ করার নির্দেশের আবেদন জানালে কোর্ট সেই আবেদন নাকচ করে দেয়। ঘটনার পরিহাস এই যে, কোর্টের সেই আদেশ নিয়ে রোগীর স্বামী এসে দেখেন দুই বৎসর কাল ধরে ভুগে হেলগা ওয়াংলি রক্তে সংক্রমণের কারণে মারা গেছেন মাত্র তিন দিন আগে।

'বৃথা চিকিৎসা' বা 'মেডিকেল ফিউটিলিটি' এক নতুন ধরনের নীতিবহির্ভূত চিকিৎসাবিভ্রাট যেটা এককথায় সংজ্ঞার আকারে প্রকাশ করা কঠিন। এ এক ধরনের অসফল, বৃথা চিকিৎসার প্রয়োগ যেটা কাঙ্ক্ষিত রোগ নিরাময়ে অকাজের। দু-একটা সহজ উদাহরণের উল্লেখ করা যাক। জীবাণুর সংক্রমণে রেজিস্ট্যান্ট অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার, আঘাত অথবা সাঙ্ঘাতিক হার্ট অ্যাটাকে হার্টের দেওয়াল ফেটে (মায়োকার্ডিয়াল রাপচার) গেলে কৃত্রিম উপায়ে হার্ট ও ফুসফুসের রিসাসিটেশন 'বৃথা চিকিৎসার' নামান্তর। কিন্তু সাপের কামড়ে সাময়িকভাবে কিডনি অকেজো হয়ে গেলে ডায়ালিসিস ও শ্বাস নেবার মাংসপেশি সাময়িকভাবে অকর্মণ্য হয়ে পড়লে ভেন্টিলেশন অত্যন্ত কাজের। আপৎকালীন চিকিৎসা প্রযুক্তির সংগঠনের নীতিনির্ধারণ কমিটি (সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, এসসিসিএম) ১৯৯৭ সালের চার ধরনের বৃথা চিকিৎসাকে অসফলতার ক্রম অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করেছে ঃ (১) অকাজের চিকিৎসা (২) যে চিকিৎসার সুফল পাওয়া প্রায় অসম্ভব (৩) যে চিকিৎসার সুফল যদিও কিছু থাকতে পারে বলে ভাবা হয়ে থাকে সেটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল (৪) যে চিকিৎসায় সুফল বিতর্কিত। তবে অনেকেই কেবল আক্ষরিক অর্থে কোনক্রমে বেঁচে থাকা নয়, চিকিৎসার ফলে রোগী কেমন মানের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারছেন, সেটাকেও গুরুত্ব দেবার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। অধিক সতর্কবাদীরা এই হিসেবের মধ্যে খরচের কথাটাও একটা নির্ণায়ক বলে মনে করেন। বিশেষ করে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশে, যেখানে স্বাস্থ্যখাতে খরচ সর্বদাই একটা বাধা সেখানে একজন ৭০ বছরের প্রৌঢ় ব্যক্তির ডায়ালিসিস ও ভেন্টিলেটরের দ্বারা কয়েক মাস আয়ুষ্কাল বাড়ানোর খরচে ১০০ জন শিশু অথবা যুবক-যুবতীর মামুলি স্বাস্থ্যরক্ষার খরচ বেশি আবেদনের ও প্রয়োজনের বলেই মনে হয়। সীমিত খরচসাপেক্ষ চিকিৎসার মধ্যে প্রাধান্য নির্ধারণের ভার সমাজের ওপরেই বর্তায়। ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশেও যে কোনো খরচে চিকিৎসা পরিষেবার খরচ-প্রাপ্তি মোতাবেকে কতটা উপযোগী, ক্রমবর্ধমান চিকিৎসা পরিষেবার কতদূর অবধির প্রয়োগ সরকার মান্যতা দেবে ও তার খরচের দায়ভার বহন করবে সেটা নির্ণয় করার জন্য বেসরকারি প্রশাসনিক সংস্থা আছে (নাইস)। খরুচে বৃথা চিকিৎসা আর খরুচে সফল চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্যটা অবশ্য ভুললে চলবে না। প্রথমটা অনৈতিক হলেও দ্বিতীয়টি সেরকম নয়। বৃথা চিকিৎসার প্রসার বন্ধ করার প্রধান অসুবিধা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ। তর্কের খাতিরে অথবা মেডিকেল কনফারেন্সে যেটা জোর গলায় বলা গেল, সেটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাবগত অযান্ত্রিক সীমা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অফিসের কর্মী সঠিক সময়ে কাজে যোগ দিচ্ছে কি না সেটা একজন প্রহরীর চেয়ে একটি যন্ত্র নির্ভরযোগ্যভাবে

নথিভুক্ত করতে পারে। মানুষের হস্তক্ষেপের মানবিক প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে যন্ত্রের কাছে হার মানে। বৃথা চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয় নি এমন নয়। এই মর্মে অ্যাকিউট ফিজিওলজি অ্যান্ড ক্রনিক হেলথ ইভ্যালুয়েশন (APACHE) পদ্ধতি ১৯৮০ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৯৮৪ সালের APACHE-র দ্বিতীয় সংস্করণের এক সমীক্ষায় ৩৬৬০ জন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের চালিয়ে যাওয়া চিকিৎসার মূল্যায়ন করে অনিয়ন্ত্রিত চিকিৎসার অন্তিম ভবিষ্যৎ ফল হিসাবে ১৩৭ জনের মৃত্যু অনুমান করা হয়। চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করা হয় না। অবশেষে দেখা যায়, ঐ ১৩৭ জনের মধ্যে ১৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই পদ্ধতি ১০০ শতাংশ সঠিকভাবে বাঁচার আশা আছে এমন মরণাপন্ন রোগীদের আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে না বলে এটা জনপ্রিয় হয় নি। বাতিল মূল্যায়নের পদ্ধতি হলেও এই প্রয়াস ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের চিকিৎসারত রোগীদের একটা বড় অংশের বৃথা চিকিৎসার একটা বিরাট পরিধির আন্দাজ দেয়। চিকিৎসা বিষয়ক যে বৈশিষ্ট্যটি ভুললে চলে না, সেটি হল চিকিৎসকদের নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য। এমন ক্ষেত্রে রোগী বা রোগীরে আত্মীয়দের খুব একটা জোরের সঙ্গে বৃথা চিকিৎসার অসারতা নিবেদন করাও যায় না। অর্থাৎ বৃথা চিকিৎসার অর্থ ব্যয়, উদ্যোগের অপব্যবহার, অসৎ উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার রোগীর ও কিছু চিকিৎসকের কাছে প্রতীয়মান হলেও একটা ত্রুটিবিহীন কার্যকরী বিধি নির্দেশিকা চালু করা মুস্কিল। রোগী, রোগীর আত্মীয় ও অন্য একজন চিকিৎসককে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকের শুভবুদ্ধির ওপর ভরসা করা ছাড়া অন্য উপায় জানা নেই।

আমেরিকান কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স ২০১২ সালে একটি বিধি স্থিরীকৃত করে, যে চিকিৎসা পদ্ধতি রোগী রোগীর পরিজনরা নিজেরা চয়ন করে নিচ্ছেন, চিকিৎসক যদি নিঃসংশয়ভাবে মনে করেন সেটি রোগের উপশমে বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না, তবে সেই চিকিৎসক নীতিগতভাবে সেই চিকিৎসা প্রয়োগ করতে বাধ্য হন। এই বিধি শেষ মুহূর্তের কার্ডিয়াক রিসাসিটেশন হলেও প্রযোজ্য। রোগীর আত্মীয়দের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বোঝাতে হবে। যখন বিশাল ঝুঁকির ও খরচের বিনিময়ে নামমাত্র ফল পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে আপাত বৃথা চিকিৎসার সংশয় সবচেয়ে বেশি। এমন ক্ষেত্রে ডাক্তাররা দায়িত্ব ভাগ করে নেন ডাক্তারদের বোর্ড গঠন করে অথবা আরও অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। বিদেশে বৃথা চিকিৎসা বন্ধ করার অন্তিম উপায় হিসাবে বিচারালয়ের দ্বারস্থ হবার চল আছে।

পশ্চিমী দুনিয়া থেকে আমদানি করা ওষুধ, গাড়ি, এরোপ্লেন ইত্যাদির সঙ্গে আমরা চোখ বুজে আমদানি করছি চিকিৎসক-রোগীর পারস্পরিক সম্পর্কের রসায়ন। চিকিৎসক ও রোগীর সম্মিলিত বোঝাপড়ার ব্যাপারটার একটা অতিরিক্ত মাত্রা পেয়ে যায় যখন একরাশ উৎকণ্ঠা মেশানো গভীর রাতে হাসপাতালে রোগীভর্তির সময়ে একগাদা ছাপানো কাগজে রোগীর আত্মীয়দের তাড়াহুড়ো করে সম্মতিসূচক সই করতে হয়। সেই অনুমতি পত্রে কী লেখা আছে সেটা পড়ে দেখার অবসর বা মানসিক অবস্থা থাকে না। হাসপাতালের একরাশ ছাপানো শূন্যস্থান পূরণ না করা কাগজে অনুমতিসূচক সই করে দিতে হয়। যদি সময় ও রুচি থাকে একবার পড়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে আপনাকে আপনার বোঝার মতো করে চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রাপ্তি ও সম্ভাব্য ঝুঁকি বুঝিয়ে বলা হয়েছে আর আপনি সেটা বুঝেই আপনার সম্মতি দিচ্ছেন। এ হল স্বচ্ছ তথ্য জানার অধিকারে শক্তিশালী একবিংশ শতাব্দীর জীবন-মরণের ক্ষুরধার অনিশ্চয়তা নিয়ে এক চরম রসিকতা।

একজন অসহায় মানুষ তাঁর দুর্বলতম মুহূর্তে একজন চিকিৎসকের কাছে অকপটে যেভাবে উন্মুক্ত করেন তার তুলনা মেলা ভার। তাঁর অতি গোপনীয় কথা তিনি একান্তে একমাত্র চিকিৎসককেই জানান। পরীক্ষা নিরীক্ষা আর চিকিৎসার জন্য তাঁর শরীর আর মন নির্দ্বিধায় চিকিৎসকের কাছে সমর্পণ করেন। অর্থ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক পেয়ে থাকেন রোগীর বিশ্বাস ও তাঁর সুস্থতার আনন্দের ভাগ। পারস্পরিক এই বিশ্বাসের নৈতিকতা কোনো অক্ষরের আইনি বাঁধনে বেঁধে ফেলার প্রচেষ্টায় বিস্তর ফাঁকি থেকে যেতে বাধ্য। বিভিন্ন পরিসরে সুসভ্য মানুষের মানবিক প্রবৃত্তিগুলো যান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণের যে চেষ্টা সঙ্গতভাবে দেখা যায় তার মধ্যে চিকিৎসক-রোগী সম্পর্ক এক বড় মাপের অসম বোঝাপড়া। নিয়মের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গোদা গোদা চিকিৎসা পরিষেবার অন্যায় রোখা গেলেও সু পরিশীলিত অন্যায় দূর করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করার জন্য চিকিৎসকের সদিচ্ছার বিকল্প বোধহয় কিছু হয় না। সামগ্রিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবাকে বাণিজ্যের পসরা

থেকে মুক্ত করে নিয়ে জল হাওয়া ইত্যাদির মতো সুস্থ সমাজের নিঃশুল্ক উপকরণে পরিণত না করতে পারলে নৈতিকতা একটা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কোনো অর্থ বহন করবে না। এ সমাজ ভোগবাদী। চিকিৎসক তারই অঙ্গ। চিকিৎসক রোগী সম্পর্ক নিয়ে দুই চিকিৎসক শুবিন ও গ্রিটসমান 'ম্যান ভারসেস ক্যান্সার' বইতে লিখছেন, 'In a society based on the principle of buy-and- sell, doctors naturally turned into enterpreneurs acquiring capital on fees paid by patients.।' সমাজে সবাই মুক্তকচ্ছ হয়ে অর্থ আর ভোগ্যপণ্যের দিকে ছুটবে, চিকিৎসকেরাই নীতি-নৈতিকতার ঠিকাদারি নিয়ে দার্শনিক নির্লিপ্ততায় বসে থাকবেন, সমাজব্যবস্থা না বদলে সেটা আশা করাও কতটা যুক্তিযুক্ত সে প্রশ্নও উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Helft PR. Siegler M, Lantos J. The rise and fall of the futility movement. N Engl J Med 2000; 343:293.
2. Mc Andrew NS, Leske JS. A Balancing Act: Experiences of Nurses and Physicians When Making End-of-Life Decisions in Intensive Care Units. Clin Nurs Res 2015; 24:357.
3. Miles SH. Autonomy's responsibility. A gloss on the Wanglie affair. Health Prog 1991; 72:30.
4. Blake DC, Maldonado L, Meinhardt RA. Bioethics and the law: the case of Helga Wanglie: a clash at the bedside ... medically futile treatment v. patient autonomy. Whittier Law Rev 1993; 14:119.
5. Consensus statement of the Society of Critical Care Medicine's Ethics Committee regarding futile and other possibly inadvisable treatments. Crit Care Med 1997; 25:887.
6. Gatter RA jr, Moskop JC From futility to triage. J Med Philos 1995; 20:191.
7. NICE, https.//en. wikipedia. org/wiki/National_Institute_for_Health_and_Care_Exellence.
8. Knaus WA, Zimmerman JE, Wagner DP, et al. APACHE-acute physiology and chronic health evaluation: a physiologically based classification system. Crit Care Med 1981; 9:591.
9. AAHPM. Statement on Withholding and Withdrawing Nonbeneficial Medical Interventions, 2011 http://aahpm.org/positions/withholding-nonbeneficial-interventions (Accessed on January 23, 2015/

পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ইতিকথা

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ধ্রুবা দাশগুপ্ত**

গত দুই দশক ধরে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র নিয়ে চর্চা হয়েছে। ময়লা জল পরিশোধনের যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এখানে চালু আছে, তা নিয়েও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এমনকি কলকাতা শহর যে জলাভূমির সস্তায় মাছ, সবজি পায় এবং বড় শহরগুলির মধ্যে কলকাতা সবচেয়ে কম খরচের শহর বলে পরিচিত, সে বিষয় নিয়েও তত্ত্ব প্রবর্তন হয়েছে। বিখ্যাত জলাভূমিবিশারদ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ এই নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। কলকাতার সংলগ্ন এই জলাভূমি নিয়ে ওঁর জনমুখী গবেষণা ও সংরক্ষণ কর্মসূচি সারা বিশ্বে পরিচিত এবং চর্চিত। এর জন্য সম্প্রতি তিনি International Union for Conservatory of Nature-এর উচ্চ শিরোপা Luc Hoffman Awardও পেয়েছেন। কিন্তু তিনিও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জেরে সাম্প্রতিককালে বলেছেন, যে কাজটা খুবই কম হয়েছে সেটা হল এখানকার মানুষের জীবনধারা নিয়ে আলোচনা।

যারা শহরের ময়লা জল পরিষ্কার করে বছরের পর বছর শহরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁরা কী ভাবেন নিজেদের জীবন সম্পর্কে? কেমন তাঁদের জীবনযাত্রা? এই ইতিহাস নিয়ে চর্চা খুব কমই হয়েছে। বর্তমান কথোপকথন সেই জানার প্রচেষ্টা। শান্তিরঞ্জন হালদার একজন অভিজ্ঞ কৃষক। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩২টি মৌজা জুড়ে এই জলাভূমির অনেক পরিবর্তনের উনি সাক্ষী। ওঁর সঙ্গে কথোপকথন জলাভূমির মানুষকে খুঁজে পাবার প্রথম ছোট পদক্ষেপ।

প্রশ্ন আপনি ভেড়িতে কাজ করতে আরম্ভ করেন সেটা কত সাল হবে?

শান্তিরঞ্জন শুরুর দিনটা এখনও মনে আছে। ১৯৮৭-র সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ। এই চকের ভেড়িতেই শুরু এবং গোটা কর্মজীবন এই ভেড়িতেই কাটিয়ে ছি। স্থানীয় নিয়মে আমার পরে ছোট ছেলে আমার জায়গায় কাজ পায়। জেলেদের দলে কাজ করে। ১০ বছর হল। ও ঢুকেছিল ২০০৭-এ।

উমা

প্রশ্ন কাজে ঢোকার আগে ভেড়ি এলাকার সঙ্গে পরিচয় কতদিনের?

শান্তিরঞ্জনঙ্ঘ অনেকদিনের। আমার মামারবাড়ি হাটগাছায়। চিলতের ভেড়িটা যেখানে শেষ, তার পাশেই মামারবাড়ি। ঘটনাক্রমে আমার জন্মও ওখানে। আমি মায়ের প্রথম সন্তান। মামাদের তখনও কোনও বাচ্চাকাচ্চা হয় নি। আমার মামাবাড়িতেই বেশি যাতায়াত ছিল। তখন থেকেই ভেড়ির সঙ্গে সম্পর্ক। এক মাসতুতো ভাই, তার বাড়ি ছিল কাদায়। গোপীকান্ত মণ্ডল। সে বড় পালাকার, যাত্রা লেখে। তার বাড়িও এখানে। দুজনে আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করতে শুরু করি মধ্য হাটগাছায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক স্তর শেষ করে মাধ্যমিক স্তরে আবার হাটগাছায় এলাম। ক্লাস এইট পাস করলাম, নাইনে আবার রাজারহাট-বিষ্ণুপুরে গেলাম। বিষ্ণুপুর রমেশ মিত্র ইনস্টিটিউশনে। রমেশ মিত্র নামকরা বিচারক। প্রথম বাঙালি জজসাহেব। তাঁরই তৈরি স্কুলে ভর্তি হলাম। পড়তে শুরু করলাম কমার্স নিয়ে। নাইন থেকে ইলেভেন– তিন বছর পড়লাম। আমাদের সময়ে বারো ক্লাসের হায়ার সেকেন্ডারি ছিল না। পড়াশোনা শেষে কাঁঠালবেড়িয়াতে আসা। বিয়ে হল। তারপর ঘাত-প্রতিঘাতে একটা কাজের প্রয়োজনে চকের ভেড়ি এসে কাজ শুরু করলাম।

প্রশ্ন এই এলাকায় যে আগে নোনা চাষ হত অর্থাৎ নোনা জলে চাষ হত এবং পরে ধীরে ধীরে ময়লা জলে মাছচাষ আরম্ভ হল, এই সম্পর্কে কিছু বলুন।

শান্তিরঞ্জনঙ্ঘ এই এলাকার প্রবীণ মৎস্যজীবী বসন প্রামাণিকের কাছে শুনছিলাম বিদ্যেধরী নদী মজে যাচ্ছে। জল আসা-যাওয়ার সমস্যা হচ্ছে; সেই জলটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে এই জলাকে বাঁচানোর জন্য। তখন বারো কপাটের একটা গেট করে দেওয়া হল (১৯৪৭-এর আগে), তারপর বানতলায় একটা গেট করা হল। এইভাবে বামুনঘাটায় নদীরই বিরাট একটা অংশ দ ছিল, এইসব থেকে প্রমাণ হয় যে, এই জায়গাটা নদীরই অববাহিকা। একদম উল্টোডাঙা থেকে শুরু করে এই দিকটা, ১২,৫০০ হেক্টর জলাভূমি, এই জলাভূমি বিদ্যাধরীরই অববাহিকা। নদী যখন মজে যাচ্ছে সেই অবস্থায় তৎকালীন যে সব জমিদার ছিল, তারা দেখল, এখানে দিব্যি মাছচাষ করা যায়। যে যার মতো করে বাঁধ দিতে শুরু করল। সব জায়গায় আমরা দেখি যে, নদী মজে গেলে তার দখলদার হয়ে যায়, বাঁধ দিয়ে তার দখল নিয়ে নেয়। এখানকার জমিদাররাও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর থেকে কুলি এনে যেই ভাঁটা পড়ে যেত, শুকিয়ে যেত, অমনি ধার থেকে মাটি কেটে কেটে বাঁধ দেওয়া শুরু করত। সেই কুলিরা থাকত দক্ষিণ হাটগাছার যে অংশটাকে কুলিপাড়া বলছি, সেই অংশটায়। তারা কাজ করত, রাতে থাকত, খাওয়া দাওয়া করত। সেইজন্যই জায়গাটাকে কুলিপাড়া বস্তি বলা হত।

সেই সময়ে জমিদার বলতে ছিলেন লক্ষীকান্ত প্রামাণিক। ছিলেন নস্কররা, মানে হেম নস্কর, অর্ধেন্দুশেখর নস্কর, পূর্ণেন্দুশেখর নস্কর, আর সাঁপুইরা। এঁরা সবাই এসে বাঁধ টাঁধ দিয়ে যে যাঁর দখলে নিয়ে নেন। সরকাররা জমিদার ছিল না, নস্করদের নায়েব ছিল। নায়েব থেকে সুযোগ নিয়ে সমীর সরকার, বিধুভূষণ সরকার আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু আসল জমিদার ছিলেন লক্ষীকান্ত প্রামাণিক, নস্কররা, সাঁপুইরা।

প্রশ্ন আর জলটা?

শান্তিরঞ্জনঙ্ঘ এরা যে বাঁধ দিত, তখনও চিংড়ির চাষটা হত। নোনা জলটা ঢোকাত, আটকে রাখত, খাল দিয়ে বেরিয়ে যেত। তারপর যখন দেখল নোনা জল আর হচ্ছে না, কলকাতা কর্পোরেশনের ময়লা জল আসছে, চিংড়িচাষ আর হচ্ছে না, তখন থেকে ময়লা জল নিয়ে কাজ শুরু হয়। যেমন, ধাপার ভেতরে সবজিচাষ, মাছচাষ দুইই শুরু করেছিল। একদিকে কলকাতার আবর্জনা ফেলছে, অপরদিকে মাছচাষ আর সবজিচাষ হচ্ছে, বাকি যে জলটা আসত সেই জলটা ভেড়িতে এনে শুরু করল মাছচাষ।

প্রশ্ন ময়লা জলের মাছচাষ আর সবজিচাষ সেটা ছোট আকারে হলেও দৃষ্টান্ত হিসেবে ছিল?

শান্তিরঞ্জনঙ্ঘ হ্যাঁ, তা ছিল। প্রথমে নোনা জলে মাছচাষ যখন হচ্ছিল না। তখনও ময়লা জলে যে মাছচাষ হয়, এটা জানা ছিল না। ঠিক সেই সময়টায় কিছু ধানচাষও হত। যে সব জায়গায় মাছচাষ হচ্ছে না, সেখানে ধানচাষ শুরু করল। ধানচাষ করতে করতে দেখল, ময়লা জল দিয়ে মাছচাষটা হচ্ছে। খাল দিয়ে এই ময়লা জলটা আসত। বি এন দে-র করা এই খাল কাটা হয়েছিল তোপসিয়া থেকে ঘুষিঘাটা পর্যন্ত, কলকাতার ময়লা জল বার করার জন্য। তার পাশ দিয়ে একটা খালও করা হল। এদের উদ্দেশ্যই ছিল, ময়লা জলে মাছচাষটা তখন শুরু করা। ধাপার সবজি চাষের শুরুও তখন। তখন থেকে যে কাজটা শুরু হল, তা চলতে থাকল। চলতে চলতে ময়লা জলে মাছচাষের অভিজ্ঞতাটা

এখানকার যাঁরা মৎস্যজীবী তাঁরা পেলেন। প্রক্রিয়াটার শুরু আমাদের জন্মের আগে থেকেই।

প্রশ্ন এই এলাকার প্রথম বাসিন্দা বলতে কি আদিবাসীরা? জেলেরা কি পরে আসেন?

শান্তিরঞ্জনদা আমাদের সমাজে আদিবাসীরা বেশিরভাগই বন জঙ্গলে বাস করত। ইতিহাসে আমরা তাই শুনি। এদের সঙ্গে মাছ ধরার একটা সম্পর্ক আর নদীনালার ধারে বসবাস করার একটা সম্পর্ক ছিল। এরা এইসব জায়গাগুলোই বেশি পছন্দ করত। সেই সূত্রে যারা মাছ ধরায় একটু বেশি পারদর্শী বা মাছচাষ করায় যারা পারদর্শী, তাদেরকেই জমিদাররা অনতে শুরু করল। জমিদাররা বা উচ্চ বর্ণের বা অন্যান্য যেসব সম্প্রদায়, তারা তো এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিল না তাই এই কাজে তারা আসতও না। আসত বেশি এই তফসিলি জাতি-উপজাতির লোকেরা। তাদের মধ্যে যাদের এখানে বেশি দেখি, তারা হচ্ছে রাজবংশী, জেলে, বাগদি, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মুণ্ডা, সরদার, মাহাতো, সিং এই সব। তফসিলি জাতির মধ্যে যারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, তারা সাধারণত চাষাবাদের দিকেই ছিল। মাছচাষে তাদের অভিজ্ঞতা অন্যান্য যে সম্প্রদায়ের কথা বললাম, তাদের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু জীবিকার প্রয়োজনে তারাও মাছচাষটা শিখে নিল। এদেরও বসবাস জলাভূমির কাছাকাছি। একদিকে ধানচাষ আর একদিকে মাছচাষ, ধাপা মানপুরের পাশেই যেসব মৌজা আছে, সেগুলো হল– বেঁওতা মৌজা, তারদহ কাপাসাতি মৌজা, ধর্মতলা পাঁচুরিয়া মৌজা। এইদিকে তারদহ ইত্যাদি মৌজায় বেশিরভাগই পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের বসবাস। এঁরাও ধানচাষের পাশাপাশি মাছচাষের সঙ্গে যুক্ত হল কাজের প্রয়োজনে। এখানকার যে সম্প্রদায়গুলি মাছচাষের সঙ্গে যুক্ত তাদের মধ্যে বলা যায় যে জেলে, রাজবংশী, আদিবাসীদের বিভিন্ন অংশ আর পৌণ্ড্র, যেমন মণ্ডল, নস্কর, আমরা, অর্থাৎ হালদাররা পড়ে। সবাই তফসিলি জাতির মধ্যে পড়ে। আমরা এই মাছচাষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম।

প্রশ্ন যারা মূলবাসী ছিল তাদের জঙ্গলভিত্তিক জীবিকা ছিল শুনেছি। সেই জঙ্গলভিত্তিক জীবন-জীবিকার ব্যাপারটা মাছচাষের সময় খুব একটা ছিল না নিশ্চয়ই?

শান্তিরঞ্জনদা সেটা তো আরও অনেক আগের ইতিহাস। সেটা যদি আমাদের ধারণায় আনতে হয়, তাহলে নদীমাতৃক যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তার প্রসঙ্গ টানতে হয়। সেই সভ্যতার ক্ষেত্রে আমাদের গঙ্গা নদীর ধার দিয়ে ওইদিকে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সাঁওতাল পরগনার কথা ধরুন, তারাও নদীর ধার দিয়ে আস্তে আস্তে ছড়িয়েছে। সাঁওতালরা এখানকার আদিবাসী। তারাও নিজেদের সাঁওতাল পরগনার অধিবাসী বলে দাবি করে। তারা আসতে আসতে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এসে পৌঁছয়। আপনি যত দক্ষিণ ২৪ পরগনার নদীধারের কাছাকাছি যাবেন, দেখবেন, সেখানে অদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাসটা বেশি।

প্রশ্ন এই এলাকায় বড় খাল ছাড়া যে অন্যান্য খাল, যেমন ঘোষের খাল, নেড়েলির খাল, আরও শাখা খাল বা শাখা-প্রশাখা কাটানোয় কি জমিদারদের অবদান ছিল?

শান্তিরঞ্জনদা নিশ্চয়, নিঃসন্দেহে। এই যে ধরুন নেড়েলির খাল। এটা যে কাটানো হয়েছে, সেটা বলা যাবে না। এই যে খালটা আমার বাড়ির হাইল্যান্ড এটা। তারপরে দেখবেন একটা ঝিল মতন বেরিয়ে গিয়েছে। মানে বিদ্যাধরী নদীর যখন বহনক্ষমতা কমে গেল, তার বুকটা কিন্তু উঁচু হয়ে গেল। আর যেটুকু রয়ে গেল, আপনি তারদহে গেলে দেখতে পাবেন, সব উঁচু জমি হয়ে গিয়েছে। যেটা নদী ছিল তার সরু একটু বেরিয়ে গিয়েছে। এই নেড়েলির খালটাও কিন্তু এখান থেকে ঘুরে বানতলায় চলে গিয়েছে বামনঘাটা হয়ে। এই যে উঁচু জমিটা, তার বিপরীতে ডান ধারটায় দেখবেন এখন মাছচাষ হচ্ছে। সেটা একটা খাল এবং নদী। পুরনো নদীরই অংশ। গেলেই বুঝতে পারবেন সেগুলোকে বাঁধ দিয়ে মাছচাষ হচ্ছে।

প্রশ্ন ছয়নাভির যতটুকু অংশ আমরা এদিক দিয়ে আসার সময় দেখতে পাই তাকে ছাড়িয়ে আমি যদি আরও পূর্ব দিকে যাই?

শান্তিরঞ্জনদা এখান দিয়ে গিয়ে আপনি বারো কপাটে যান, দেখবেন নদীকে যে বাঁধা হয়েছিল, বারো কপাটটা তার একটা প্রমাণ। ওখানে যে সবচেয়ে পুরনো একটা কোঅপারেটিভ আছে, সেটাকে পঞ্চানন খাল বলে নাম দিয়েছে। পঞ্চানন খালটা কিন্তু নদীরই অববাহিকা, নদীই ছিল। এই নদী ওখান দিয়ে ঠাকুরদাঁড়ির ভেতর দিয়ে সেই যাত্রাগাজির দিকে চলে গিয়েছিল। আমরা ওখানে জনভাঙার মুখ বলতাম একটা জায়গাকে, সেটা খুব নীচু জায়গা ছিল, সেখান দিয়ে বেরিয়ে যেত। আর ওই যে খালটা, যাকে 'কাটা খাল' বলি, কাটা হয়েছে শহরের জলটাকে নিকাশির জন্য। আমার জন্মের পরে দেখেছি কেষ্টপুর থেকে যাত্রাগাজির ভেতর দিয়ে

বনমালীপুর, সোনপুর— ওখান দিয়ে ঘুষিঘাটা নদীতে গিয়ে পড়েছে, সেটা ময়লা খাল। সেটাও কিন্তু অনেক পরে কাটা হয়েছে। আমি বেশ বড় হয়ে গিয়েছি তখন কাটা হয়েছে। তাই খুব প্রাচীন নয়। খালগুলো কাটার কারণ হিসাবে আমার যেটা মনে হয়েছে, বর্ষায় যে জলগুলো জমে থাকত, এই যে বিল, কালিংয়ের বিল, যাত্রাগাজির বিল, ধুপির বিল, এরকম যে নামগুলো অমরা এখন পাই আশেপাশে, এই বিলগুলোতে নীচু দেখে চাষ হত না। ধানচাষও নয়। সেখানে হোগলা, ঘাস এইসব ছিল। বাকি যে উঁচু জায়গাগুলোয় চাষ হত, চাষীরা দেখত, চাষ করে জল বার হতে পারছে না। মানে, নীচু জায়গায় চাষ করে কোনো লাভ হচ্ছে না। আগে রুরোন ফেলা হত। গরমের সময় জলটা শুকিয়ে যেত। সেখানে চষে আরও ধান ছড়িয়ে দেওয়া হত। তার ফলে ধানগুলো লম্বা হয়ে জলেই অনেক বড় হয়ে যেত। যখন জল কমে যেত, ধান হলে কেটে নিত মাথাটা। এইরকম সব বিলগুলো চাষের জন্য ব্যবহৃত হত। তখন বন্যাও হত। যেহেতু নদীগুলো মজে যাচ্ছিল, জলের নিকাশি হচ্ছিল না। বন্যায় ভেসে যেত। সেইজন্য খালগুলোর প্রয়োজন হয়েছিল। এই যে বি এন দে-র খাল, এই খালটা কাটা হয়েছে সরকারি উদ্‌যোগে। কেষ্টপুরের খালটাও গভর্নমেন্টের।

প্রশ্ন আমি বুঝতে চাইছিলাম শাখা খালগুলির কথা, যেটা দিয়ে ময়লা জল আসবে, যেটা হচ্ছে ভেড়ির প্রাণ, সেই খালগুলো।

শান্তিরঞ্জনদা একদম ঠিক। এই যে নেড়েলির খালের কথা আপনি বললেন, এটা একটা নদী ছিল। কিন্তু চিংড়িঘাটার থেকে যে এই খালটা (পরান চাপরাশির খাল) এইটা তৎকালীন সমীর সরকাররা কাটিয়েছিলেন। এইজন্য এই খালের অধিকার পাবার জন্য চেষ্টা করত। জমিদাররা মনে করল, প্রত্যেকটি ভেড়িতে ময়লা জল ঢোকার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তার জন্য এই খাল কাটা আর প্রয়োজনের বাইরের জলটা বার করার জন্য আর একটা খাল দরকার। সেই কারণেই, যেমন এই মেড়েলির খালটা, কাটানো নয়, কিন্তু ভেড়িতে জল ঢোকানোর জন্য খাল মালিকেরা কাটল এবং জল বার করার জন্য এই খালটাকে ব্যবহার করল। যেহেতু ওইদিক দিয়ে জলটা সবসময় ঢুকছে আর এদিক দিয়ে বার হচ্ছে। নেড়েলির খাল দিয়ে বার হয়ে কাটা খালে পড়ে যাচ্ছে। ভেড়ির জল বার করার জন্য নেড়েলির খালটা ব্যবহৃত হল।

প্রশ্ন ঘোষের খালের সম্পর্কে কী জানা যায়?

শান্তিরঞ্জনদা ঘোষের খালটা কাটানো খালই। ঘোষের খাল বানতলা থেকে ঢুকে নোমপোতার পাশ দিয়ে ঝগড়াশীষার (ভেড়ি) কোল দিয়ে হাটগাছা ডানদিকে রেখে, বাঁ দিকে ঝগড়াশীষা (ভেড়ি), চিলতে, ৩নং পাত্রাবাদের পাশ দিয়ে গিয়ে মূল খালের (কেষ্টপুর খাল) মধ্যে পড়ছে।

প্রশ্ন তৎকালীন জমিদাররা যে মাছচাষের ব্যবস্থার পত্তন করলেন, তার মধ্যে খাল কাটানো এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাটা নিজেরা নিতেন?

শান্তিরঞ্জনদা হ্যাঁ, জমিদাররা এটা নিজেদের দায়িত্বে করতেন। শ্রমিক যখন যারা আসত, কাজ করত, পয়সা নিত, চলে যেত। এ ব্যাপারে তাদের কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না।

প্রশ্ন আর কী কী দায় বা দায়িত্ব জমিদারদের ছিল?

শান্তিরঞ্জনদা প্রথমত তারা মনে করত এই যে সম্পত্তি যা তারা দখল করেছে, নানা কৌশলে তা তাদের নামে করার চেষ্টা করত। করেওছে। তৎকালীন তাদের ছেলেরাই ছিল জজ-ব্যারিস্টার বা উকিল। তারা এটা করেছে— 'এই সম্পত্তি আমাদের চিরস্থায়ী, জমিদার লক্ষীকান্ত প্রামাণিক আমি, এই সম্পত্তিগুলি আমার।' এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করতে গেলে যদি মাছচাষ করতে হয়, তাহলে মাছচাষ করাতে যা যা লাগে তা করাতে হবে— তার জন্য শ্রমিক দরকার, পরিচালনার ম্যানেজার দরকার, হিসেবরক্ষক দরকার, পরিচালনা করার প্রয়োজনে এগুলো করতে হয়েছে। আর যেটা খাল কাটা, ভেড়ির নাব্যতা রক্ষা করা, ভেড়ির ইনলেট দিয়ে জল নিয়ে আসা, আউটলেট দিয়ে বার করা, মাছ উৎপাদন করে সেই মাছটা বাজারে বিক্রি করা— এইসব করতে গেলে যে লোক-লস্কর, মজুর দরকার, সেগুলো জমিদার বা তার ম্যানেজার লোকজন দিয়ে করাত।

প্রশ্ন মাছচাষের জন্য যে পাটা তৈরি করতে হয়, এটা প্রথম কার মাথায় আসে, তা নিয়ে কিছু কি শোনা যায়?

শান্তিরঞ্জনদা না।

প্রশ্ন তারপর খুরচি ইত্যাদি ছোট ছোট মাছ চাষের উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত।

শান্তিরঞ্জনদা এর ইতিহাস বলা খুব মুশকিলের ব্যাপার। কারণ এগুলো অতি প্রাচীন ইতিহাস। নদীমাতৃক দেশ আমাদের এবং যেহেতু আমরা সুন্দরবন এলাকার মানুষ, নদী সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একেবারে জালের মতো রয়েছে। এখানকার মানুষ বিভিন্ন জায়গায় মাছধরার প্রয়োজনে, কী জিনিস তৈরি করলে মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করা যায় তারা তা জানত। পাটার কথা আপনি বললেন। আমরা যেমন বলি ঘুনি, আটল, ধজনা, দীপ্তি— এগুলো সব বাঁশের তৈরি। মাটি বইবার কাজে লাগে ঝুড়ি, চুবড়ি, পোলো। যাঁরা মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা আগে থেকেই শিখেছেন। ভেড়ি এলাকায় মাছ চাষ করতে গেলে যে কী ধরনের উপকরণ লাগবে তাঁরা জেনেছেন অভিজ্ঞতা দিয়ে। আমি একজন অতি পুরনো লোকের কথা বলব যিনি মারা গিয়েছেন অন্তত ১৫ বছর হবে বা তারও বেশি, তাঁর নাম মাখন ম্যানেজার। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার কেয়াপুকুরে। উনি চকের ভেড়িতে ম্যানেজার ছিলেন। ওঁর হাতের কাজ এত সুন্দর ছিল যে, ভাবা যায় না। আমি জিজ্ঞাসা করতাম, এত সুন্দর কাজ আপনি শিখলেন কী করে? উনি বলতেন, এ তো আমাদের জাতব্যবসা। বাবা করে গিয়েছেন, ঠাকুরদাও করে গিয়েছেন। আমি তাঁদের কাছ থেকেই শিখেছি। বলতেন, আমি চকের ভেড়ির আগে কংসের চরে ছিলাম। তারপর ১নং পাত্রাবাদে ছিলাম, এখন চকের ভেড়িতে। যখন যে মালিক বলে আমাকে একটু বেশি পয়সা দেবে, সেখানে যাই। কাজ শেখার অতীত হচ্ছে বাপ-ঠাকুরদা। তবে ঠিক কার থেকে শিখেছি বলা মুশকিল। তাঁরা করে গিয়েছেন, আমরাও করছি। যেমন চাষী, ধারাবাহিকভাবে চাষ করতে করতে চাষটা শিখে যান। আমাদের ভেড়ি অঞ্চলে যে উপকরণের কথা বলছেন, যা সাধারণত ব্যবহৃত হয়--- পাটা, ধজনা, পোলো, ইশেল বাঁধ (মেরামতের জন্য ইশেল লাগে) পানা দিয়ে ঘিরে রাখার জন্য বাঁশের খুপি করে দড়িতে বেঁধে রাখতে হয়, তাই বাঁশ লাগে। এখানে যখন বিল ছিল, তখন বর্ষা শুরু হতেই বাঁধের পাশ দিয়ে সব জল যাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। ওই পাড়ের জন এই পাড়ে আসত, সেইসব জায়গাগুলো বাঁধ দেওয়া হত জল বের করানোর জন্য। সেইসব বাঁধে গিয়ে ওইসব ধজনাগুলো ঘিরে দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হত। এইদিকে জলটা টান যাচ্ছে, এই মুখো করে ধজনা বসিয়ে দিলে মাছগুলো এসে ধজনার মধ্যে ঢুকলো, মাছ ধরা পড়ল তারপর খাবার ব্যাপার, বিক্রি করার ব্যাপার। সেখানে স্রোত নেই, জল থিতিয়ে আছে, ধানচাষ হয়েছে। আল দেওয়া হয়েছে ধানচাষের মাঠে। আলে দেখা গেল যে ঘাসটাস দিয়ে বাঁধ করে দিয়ে মাঝে মাঝে সেই ধজনা, আটল, ঘুনি এসব বসানো হত। সাধারণত দিনের বেলা মাছেরা অত ছোটাছুটি করে না, রাত্রে মানুষজন না থাকলে তখন একটু এদিক-ওদিক করবে খাবার প্রয়োজনে। যখন যেখান দিয়ে ফাঁক পাবে সেখান দিয়ে যাবে আর 'ঘাই' বলা হয় এগুলোকে --- 'ঠিকমতো জায়গায় আটলচা পাতো, মাছ সেখান দিয়ে আসবে, আটলে ঢুকবে, পড়বে। আমরা মাছগুলো ধরব।' ঘুনিগুলো দিয়ে ছোট ছোট মাছ ধরা হত। চুনো মাছ বা চিংড়ি, পুঁটি, পাঁকাল—এইসব মাছগুলো ঘুনির মধ্যে পড়ে। এইরকম আল এসেছে, মাঝখানে কেটে দেওয়া হল, সেখানটায় বসানো হল একটু বেশ কায়দা করে--- এবার মাছ এপাড়-ওপাড় করতে থাকলে ঘুনির মধ্যে পড়বে।

(চলবে)

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার স্বীকৃতিতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুরস্কার পেলেন শ্রী আশীষ লাহিড়ী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বাঙলা ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার মঞ্চ কর্তৃক আয়োজিত বাঙলার মুখ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-স্মারক সম্মাননা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ২৭ আগস্ট ২০১৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ সম্পন্ন হল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নামাঙ্কিত পুরস্কারটি পান শ্রী আশীষ লাহিড়ী। পুরস্কার তুলে দেন পরিষৎ সভাপতি শ্রী বারিদবরণ ঘোষ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-কে নিয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন শ্রী লাহিড়ী।

পুরানো সেই জলের কথা

ভূপতি চক্রবর্তী

বাসী বা পুরনো খাবার খেতে আমাদের কারোরই ভাল লাগে না। খাদ্য বা পানীয় যাই হোক না কেন, তা টাটকা হলে তার স্বাদই আলাদা! তাছাড়া পুরনো খাবার বা পানীয়, তা যদিপচা বা দুর্গন্ধযুক্ত যদি নাও হয়, তাহলেও স্বাদে জানান দেয় যে, সেটি অন্যরকম। অবশ্য অপচয় এড়াতে কিছুটা পুরনো খাবার হয়ত আমাদের অনেক সময় গলাধঃকরণ করতেই হয়। তবে দেখে নিই যে সেটি মোটামুটি খাওয়ার মতো আছে কি না। অথচ এরকম একটা অবস্থায় বিশ্বজোড়া সমস্ত মানুষ, না কেবল মানুষ নয়, সমস্ত প্রাণী এক অতি বাসী, অত্যন্ত পুরনো এক পানীয় প্রতিনিয়ত গ্রহণ করে চলেছে। তাকে ছাড়া জীবন অচল অথচ তাকে টাটকা খাওয়ার উপায়টি পর্যন্ত নেই। ঠিকই অনুমান করেছেন, আমি আমাদের অতি পরিচিত এবং সতত প্রয়োজনীয় জলের কথাই বলছি।

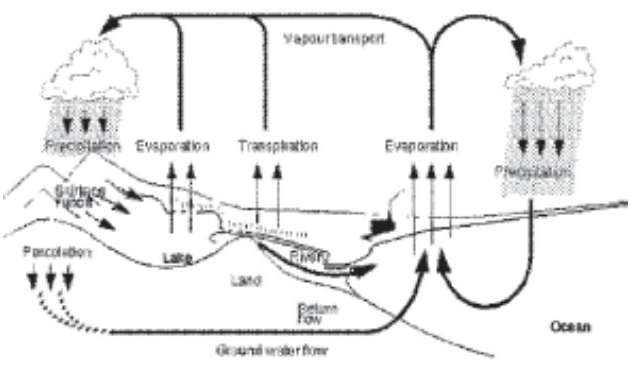

তৃষ্ণা নিবারণে এক গ্লাস পরিষ্কার টলটলে জল, যা হবে ঠাণ্ডা কিন্তু কনকনে নয় এবং একেবারে 'টাটকা' তার তো সত্যিই কোনো তুলনা নেই, বিশেষত আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। এখানে টাটকা বলতে আমরা বুঝি যে জলটি হয়ত কোনো ফিল্টার থেকে এখনই গ্লাসে ভরে নেওয়া হয়েছে বা নলকূপ থেকে পাম্প করে তাকে সদ্য তোলা হল অথবা একেবারে মুখবন্ধ কোনো মিনারেল ওয়াটারের বোতল খুলে তাকে এইমাত্র গ্লাসে ঢালা হল। এরকম জল পান করলে তৃপ্তি তো হবেই। আর তাকে টাটকা বলে মনে করাই তো স্বাভাবিক! তাই তা কেবল তেষ্টা মেটাবে না, মনে শান্তিও দেবে।

এই জল অবশ্যই পানের উপযোগী। যদিও যে জল আমরা পান করি সেই জল যে একশো শতাংশ জীবাণু বা অবাঞ্ছিত রাসায়নিক মুক্ত, তা বলা যাবে না। তবে অধিকাংশই পানের উপযুক্ত। আসলে যে জল আমরা পান করে চলেছি, তা সে যে উৎসেরই হোক না কেন, তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন নেই; প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। যে এক গ্লাস জল পান করে আমাদের গলা থেকে প্রায় আমাদের অজান্তেই একটা পরিতৃপ্তির শব্দ উঠে এসেছিল সেই জলটা কি টাটকা ছিল?

জল তো গাছের ফল বা পুকুরের মাছ কিংবা বাগানের সব্জি নয় যে সেটি টাটকা কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে! আদতে জল টাটকা বলতে বোঝানো হচ্ছে যে, এই জল কি সদ্য তৈরি হয়েছে? দু পরমাণু হাইড্রোজেন কি বাতাসে ভেসে বেড়ানো অক্সিজেন কিংবা অন্য কোনো যৌগ ভেঙে সদ্য বেরিয়ে এসে এক পরমাণু অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জলের একটা অণু গঠন করল? না, তা যে হয় নি সেটা আমরা জানি। বেশ কয়েকটা সবজি তেল মশলায় মাখামাখি হয়ে তাপের প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে যে চমৎকার তরকারিতে পরিণত হয়, তা যে টাটকা তা নিশ্চয়ই বলতে হবে না। জল অবশ্যই এরকমভাবে আমাদের কাছে পৌঁছচ্ছে না। একটু বরং সেদিকে নজর দেওয়া যাক। দেখা যাক, জলের চলাফেরাটা ঠিক কীরকম।

স্কুলে ভূগোলের ক্লাসে আমরা শিখেছি, ভূপৃষ্ঠের প্রায় চারভাগের তিন ভাগ বা পঁচাত্তর শতাংশ জুড়ে রয়েছে জল। ভূগোলকের একটি মডেলের (যাকে সচরাচর গ্লোব বলা হয়) দিকে তাকালেও সেটা বোঝা যায়। কিন্তু এই জল সাগর বা মহাসাগরের জল, যা একেবারেই পানের উপযুক্ত নয়। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে রয়েছে বরফের আস্তরণ। সুমেরু ও কুমেরুর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। বরফের সাম্রাজ্য। জল সেখানে আটকা পড়ে রয়েছে। ফলে পান করার মতো

জলের সত্যিই অভাব রয়েছে। পৃথিবীতে উপস্থিত মোট

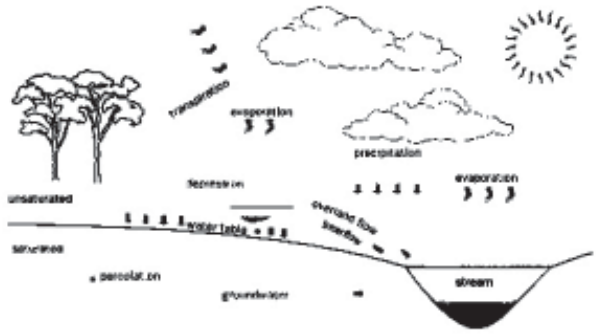

জলের মাত্র এক শতাংশ আমাদের পানের উপযোগী।

কোথায় রয়েছে সেই জল? এই জল রয়েছে নদী, বড় জলাশয় বা বড় হ্রদ, ছোট-বড় নানা ধরনের পুকুরে এবং অবশ্যই ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে। এই ধরনের জল অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি পান করা যায় না, তবে তা পরিস্রুত করে গ্রহণ করা সম্ভব। এই জলকে পানের উপযুক্ত বলবার কারণ হচ্ছে যে, এই উৎসগুলির জল ততটা লবণাক্ত নয়। দেখা গেছে, সমুদ্রজলের লবণের মাত্রা পাঁচ শতাংশ বা তার বেশি। অর্থাৎ প্রতি একশো মিলিলিটার বা একশো ঘন সেমি জলে পাঁচ গ্রাম বিভিন্ন ধরনের লবণ উপস্থিত রয়েছে। অন্য উৎস থেকে নেওয়া জলে রাসায়নিক বা জীবাণুগত দিক থেকে কিছু অপদ্রব্য মিশে থাকলেও তা স্বাদে লবণাক্ত নয়। তাই এই জলকে পরিস্রাবণের পর পান করা সম্ভব। লবণাক্ত সমুদ্রজলের থেকে তাকে আলাদা করতে এই জলকে বলা হচ্ছে মিষ্টি জল, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ফ্রেশ ওয়াটার।

যে জলকে আমরা পানের উপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছি শহরাঞ্চলে, তাকে আমরা আরও অনেক কাজে ব্যবহার করছি। যার মধ্যে গার্হস্থ্য কাজ, বাগানে জল দেওয়া, বাড়িঘর পরিষ্কার রাখার কাজ প্রভৃতি রয়েছে। অন্যদিকে এই জল যাকে সচরাচর মিষ্টি জল বলা হয়ে থাকে, তা পরিস্রুত না করে ব্যবহার করা যাচ্ছে কৃষিকাজে, ক্ষেত্রবিশেষে কিছু শিল্পে। তবে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জলের অনেক ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। সে আলোচনায় এখানে যাচ্ছি না।

একদিকে রীতিমতো অর্থব্যয় করে জলকে পরিস্রুত করে নিয়ে নানা কাজে ব্যবহার করার পর সেই জলের পরিচয় দাঁড়াচ্ছে বর্জ্য জল; অন্যদিকে আবার পরক্ষণেই খোঁজ করছি ব্যবহারের উপযুক্ত জলের। জলের এই অবিরত চাহিদা কীভাবে মিটছে? অবশ্যই প্রতিনিয়ত নতুন জল তৈরি হচ্ছে না, যেমনটা সূর্যে কেন্দ্রক সংযোজন প্রক্রিয়ায় সতত শক্তি তৈরি হয়। অতএব পুরনো জলকে বারবার ব্যবহার করার ওপরেই আমরা নির্ভর করি। আর এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছে প্রকৃতি তার বারিচক্রের বা জলচক্রের মধ্যে দিয়ে। মূলত সূর্যের তাপে নদ-নদী, খাল-বিল বা সমুদ্রের জল প্রতিনিয়ত বাষ্পীভূত হয়ে চলেছে। এই জলের মধ্যে রয়েছে আমাদের বা অন্য প্রাণীর শরীরের বর্জ্য জলও। বাষ্পীভূত জল মেঘের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে ফেরত আসছে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। তবে স্থানবিশেষে কেবল বৃষ্টিপাত নয়, পৃথিবী থেকে উবে যাওয়া জল তুষারপাত বা শিলাবৃষ্টি কিংবা ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ফিরে আসছে পৃথিবীর বুকে; আবার ভরিয়ে তুলছে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী জলের উৎসগুলিকে।

তাহলে বলা যায় যে জলের অণুগুলি বহু বহু বছর ধরে এই চক্রের মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হয়ে বারবার ফেরত আসছে ভূপৃষ্ঠে এবং আবার বিদায়ও নিচ্ছে। পরিযায়ী পাখিকে যেমনভাবে চিহ্নিত করে তার গতিবিধি আঁচ করার

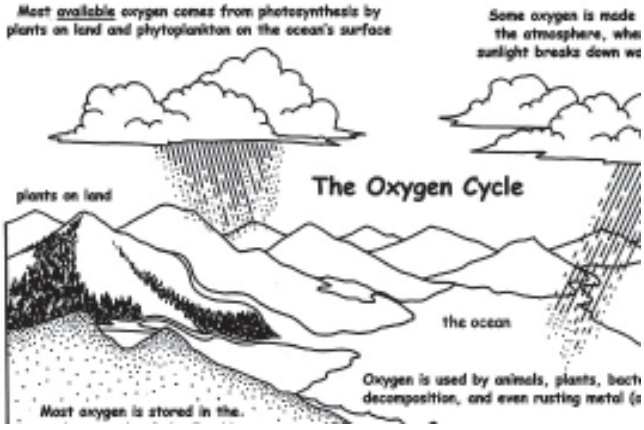

চেষ্টা হয়, তেমনই যদি কোনো বিশেষ উপায়ে একেবারে অভিন্ন কয়েকটি জলের অণুকে আমরা চিহ্নিত করে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ করতে পারতাম, তাহলে হয়ত দেখা যেত, এক বছরের মধ্যে সেই অণু কর্ণাটকের পুকুরে কয়েকদিন কাটিয়ে তামিলনাড়ুর নদীর অংশ হয়েছে, তারপর হয়ত বঙ্গোপসাগরের থেকে বাষ্পীভূত হয়ে মেঘবাহিত জলকণা বৃষ্টির সঙ্গে আছড়ে পড়ছে কলকাতার নদীর বুকে। সেই অণুকে ধরে নিয়েছে নগর নিগমের পাম্প, ফেলে দিয়েছে তাকে, ধরা যাক, গার্ডেনরিচের জল পরিস্রাবণ কেন্দ্রে আর তারপর তিনি নলবাহিত হয়ে ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে এসে প্রবেশ করেছেন আপনার গ্লাসে।

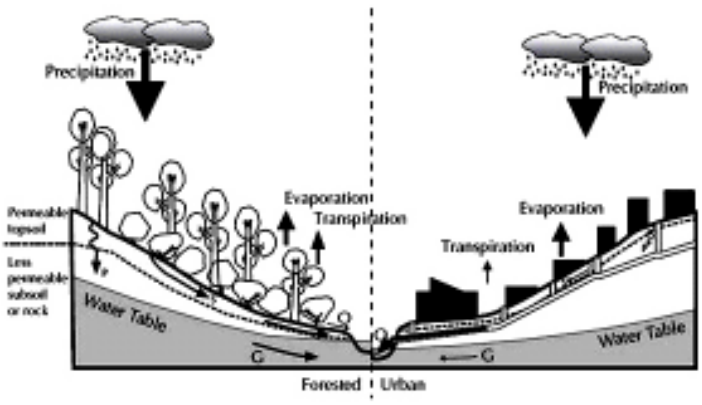

তারপরও সে কিন্তু হারিয়ে যাবে না। আমাদের শরীরে বর্জ্য জল বা ঘাম হিসেবে সে আবার বারিচক্রের অন্তর্গত হবে। একইভাবে ফিরে আসবে, হয়ত বা উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা আমাদের এক সহ নাগরিকের গেলাসে ঐ একই অণু তার সাঙ্গোপাঙ্গ একদল নিয়ে ঐ মানুষটির দেহে প্রবেশ করে তার গলায়ও তুলে আনবে সেই পরিতৃপ্তির শব্দ। বিষয়টিকে একটু প্রসারিত করে ভাবলে দেখা যাবে, যে জলের অণু আজ আমার তেষ্টা মেটাচ্ছে তা হয়ত একশো বছর আগে আমার কোনো পূর্বপুরুষের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। হয়ত বা দুশো বছর আগে বহু দূরদেশে থাকা কোনো অতি বিখ্যাত পণ্ডিতের শরীরেও প্রবেশাধিকার পেয়েছিল এই অণু। তিনি কিন্তু নিউটন বা আইনস্টাইন হতে পারেন। আবার হতে পারেন পিথাগোরাস বা অ্যারিস্টটলও। ঠিক একইভাবে আপনার শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে যে অক্সিজেন পরমাণুগুলি প্রবেশাধিকার পেল তারাও কিন্তু এই গ্রহের সুপ্রাচীন বাসিন্দা। অক্সিজেন চক্রের মধ্যে দিয়ে একই অক্সিজেন অণু বারবার নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই যে অক্সিজেন অণু আপনার শরীরে এইমাত্র প্রবেশ করল, তা একদিন হয়ত প্রবেশ করেছিল আগে উল্লিখিত বা অন্য অনেক বিরাট মানুষের ফুসফুসে অথবা সেই অণু হয়ত ঘুরে এসেছে পৃথিবীর ইতিহাসে অতি পরিচিত কোনো কুখ্যাত অন্দরমহল। তাদের নাম? সেটা আপনিই ভেবে নিন না!

তবে আরও একটু জটিলতা রয়েছে। জলের কিছু অণু এই চক্রে আবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনও কখনও অন্য কাজে যোগ দিচ্ছে। উদ্ভিদেরা তাদের খাদ্য তৈরি করার জন্য সূর্যালোকের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই- অক্সাইডের সহায়তায় জল বা জলীয় বাষ্প নিয়ে গ্লুকোজ তৈরি করছে। এই সময় তারা আমাদের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ফেরত দিচ্ছে যা প্রাণীজগতের নিবিড় প্রয়োজনে আসছে। তবে এই প্রক্রিয়ায় জলের অণু ভেঙে তার হাইড্রোজেন ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে গ্লুকোজ তৈরিতে। ফলে অনেক সময় আমাদের তেষ্টা মিটিয়েছিল যে জলের অণুটি তা হয়ত ভেঙে গিয়ে সেখানকার অক্সিজেন আলাদা হয়ে গিয়েছে। এরকম দুই পরমাণু অক্সিজেন মিলে অক্সিজেন অণু তৈরি হয়ে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করছে। এই নব্য অক্সিজেন বিভিন্ন ধরনের। অণুর দুটি পরমাণু আপাতদৃষ্টিতে হয়ত মাত্র কিছুদিন আগে জল ভেঙে বেরিয়েছে, কিন্তু আদতে তা ছিল এই পৃথিবীতেই। অতীতে হয়ত জলের অণুর অংশ হিসেবে একটি বিশেষ অক্সিজেন পরমাণু ছিল জলচক্রের অঙ্গ, এখন সে নতুন এক চক্র অর্থাৎ অক্সিজেন চক্রে অণু হিসেবে আবর্তিত

যে জলের অণু আজ আমার তেষ্টা মেটাচ্ছে তা হয়ত একশো বছর আগে আমার কোনো পূর্বপুরুষের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। হয়ত বা দুশো বছর আগে বহু দূরদেশে থাকা কোনো অতি বিখ্যাত পণ্ডিতের শরীরেও প্রবেশাধিকার পেয়েছিল এহ

হচ্ছে। ঘুরপাক খাওয়ার ডিউটি থেকে তার ছুটি নেই। যে তেষ্টা মেটানোর কাজ করেছিল সে-ই এখন শ্বাস গ্রহণে সাহায্য করছে। অনন্য জীবনদায়ী ভূমিকা তার।

আমরা যদি এই চক্রগুলির চিত্র দেখি তাহলে বোঝা যাবে, বারিচক্র, অক্সিজেনচক্র বা কার্বন ডাই-অক্সাইডচক্র সতত চালু থাকায় পৃথিবীতে জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই চক্রগুলির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অক্সিজেন এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে, কারণ কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি অণুতে রয়েছে দুটি অক্সিজেন পরমাণু আর জলের একটি অণুতে রয়েছে একখানি অক্সিজেন পরমাণু। তা ছাড়া তার রয়েছে স্বাধীন অস্তিত্ব। তাই আমাদের পৃথিবীর আদি ভাণ্ডারে যে অক্সিজেন ছিল তা নানারূপে কেবল থেকে যায় নি বিভিন্ন চক্রের মধ্যে দিয়ে যে চলমান সাম্যের সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে একই অক্সিজেন বারবার কাজ করে চলেছে। একেবারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

হ্যাঁ চিরস্থায়ী ঠিকই; যদি না আমাদের কিছু অবিবেচক কাজ এই সাম্যকে ব্যাহত করে, যদি এই প্রাকৃতিক চক্রগুলিকে তাদের স্বাভাবিক ছন্দে আমরা চলতে না দিই নানা কারণে এই চক্রগুলিতে কিছু বাধার সৃষ্টি করছে মনুষ্যসৃষ্ট বহু কাজ। এই কাজের সবটুকুই অপ্রয়োজনীয় বা বর্জন করার মতো, এমন কথা বলা যায় না। তবে মনে রাখতে হবে, এক জায়গায় যা ক্ষতিসাধন করা হচ্ছে অন্যত্র সেটা পরিপূরণ করার দায়িত্বও আমাদের রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা জলের যে অণুতে তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন বা যে অক্সিজেন অণু তাঁদের ফুসফুসে পৌঁছে গিয়েছিল আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের সাহায্যেই সেই প্রয়োজন মেটাতে পারলে অর্থাৎ ঐ বাসী, পুরনো, সুপ্রাচীন অথচ পচা নয় ঐ উপাদান ব্যবহার করে জীবনের পথে চলতে পারলে তা আমাদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করবে। আর এই চাহিদাটা কেবল মানুষের নয়, সমস্ত জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগতের। সকলেই বাঁচার জন্য তাকিয়ে আছে ঐ সুপ্রাচীন ভাণ্ডারের দিকে। 'পুরানো জানিয়া' তাকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই।

উমা

বিশ্বাসে মিলায়

সুব্রত ঘোষ

দেহের ওপর মনের প্রভাব প্রমাণিত। শঙ্করাচার্য বলতেন, 'জিতেন জগৎ কেন, মনো হি যেন।' যে মনকে জয় করতে পারে সে জগৎ জয় করতে পারে। মনের জোরে যে আমরা দৈহিক শক্তিকে অতিক্রম করতে পারি, তার উদাহরণ ভূরি ভূরি। আবার দৈহিক সমস্যা থেকে মানসিক সমস্যারও সূত্রপাত হয়। চিকিৎসা পরিভাষায় যা সাইকো-সোমাটিক বা কর্টিকো-ভিসারাল ডিজঅর্ডার। বিপরীতে শারীরিক সমস্যা থেকেও মনের সমস্যা তৈরি হতে পারে, যা সোমাটো-সাইকিক। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমাদের শাস্ত্রে বলে 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ/বস্তু'। বিশ্বাসে শুধু কৃষ্ণ মেলে না, বহু কঠিনতর অসুখবিসুখ আপাতভাবে সেরে যায়, ঝিমিয়ে পড়া লোক চাঙ্গা হয়। জলপড়া, জড়িবুটি, রেইকি থেকে হোমিওপ্যাথির মতো শিল্পগুলো দাঁড়িয়ে আছে এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই। জলপড়া বা ডাইলিউশন থিয়োরি মেনে তৈরি হোমিও ওষুধে দ্রব্যগুণ থাকে না, তাও আশ্চর্যভাবে কাজ করে। এমনকি ক্যান্সারের মতো রোগও সেরে যায় বলে দাবি করতে পিছুপা হন না হোমিও চিকিৎসকেরা। ম্যানিলায় 'সাইকিক সার্জারি', মানে বিনা ছুরি-কাঁচিতে অস্ত্রোপচারকে ঘিরে এক বিরাট বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। দেশ-বিদেশ থেকে পালে পালে লোক গিয়ে হাজির হচ্ছেন। সাইকিক সার্জেনরা খালি হাতই পেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টিউমার বের করে আনেন। তুলো দিয়ে মুছে দেওয়ার পর কাটা জায়গার চিহ্নমাত্র থাকে না। এর পর রোগী আর ভাল না হয়ে যান কোথায়! দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগীরাও নাকি ভাল হয়ে ফেরেন ওখান থেকে। এই জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গিয়েছে। তবু রোগীদের সংখ্যা কমছে না। এই বিনা দ্রব্যগুণে অসুখ সেরে যাওয়া বা ভুয়ো অস্ত্রোপচারে আরোগ্য হওয়ার রহস্যটা কী? একেই মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন প্ল্যাসিবো এফেক্ট। একেবারে বিশ্বাসে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা আরোগ্যলাভ। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে আমেরিকায় হৈচৈ ফেলে দেবার মতো কাণ্ড ঘটিয়ে বসল এলিসা পারকিনস নামে এক

ডাক্তার। হৈচৈ ফেলে দেবার মতো কাণ্ড তো বটেই। কোনো কাটাছেঁড়া, কোনো ওষুধপত্র নয়— তাঁর হাতে কেবল এক জোড়া ধাতব দণ্ড। যে কোনো ব্যথা নিয়ে রোগী এলে রোগীর ব্যথার জায়গায় কয়েক মিনিট ওই জোড়া দণ্ড বুলিয়ে যাচ্ছেন। একটু পরেই সব ব্যথা ভ্যানিশ।

এই জোড়া ধাতব দণ্ডের তিনি নামকরণ করলেন— 'ট্র্যাকটর'। তাঁর উদ্ভাবিত 'ট্র্যাকটর' ১৭৯৬ সালে আমেরিকায় চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রথম পেটেন্ট প্রাপ্তির সম্মান পেল। পারকিনস বললেন, আমাদের শরীরের সমস্ত ব্যথার মূলে এক ধরনের ক্ষতিকর বৈদ্যুতিক তরল পদার্থ। তাঁর ট্র্যাকটরের এমনই এক গুণ, যা দিয়ে নাকি এই ক্ষতিকর বৈদ্যুতিক তরল পদার্থকে শরীর থেকে টেনে বার করা যেত! ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক সমর্থন তো ঠিক তখনই হাতের কাছে জুগিয়ে দিলেন ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক লুইগি গালভানি (১৭৩৭-১৭৯৮), যিনি প্রাণী-বিদ্যুতের আবিষ্কর্তা, বায়োইলেকট্রোম্যাগনেটিক্সের প্রবর্তক। গ্যালভানি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখালেন, সপ্রাণ বস্তুর নার্ভ প্রাণী-বিদ্যুতে সাড়া দেয়। কাজে সন্দেহই রইল না যে ট্র্যাকটরের গোটা ব্যাপারটাই বিদ্যুতের লীলা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে। ট্র্যাকটর দিয়ে প্রায় ৫০০০ রোগীর তিনি ব্যথার উপশম করেছেন বলে দাবি করলেন এবং সবাই সাধারণ লোক ছিলেন এমন নয়। স্বয়ং ওয়াশিংটনও ট্র্যাকটরের গুণে উপকৃত। এর চেয়ে বড় বিজ্ঞাপন আর কী হতে পারে!

এলিসার পুত্র বেঞ্জামিন ইংল্যান্ডে এলে তাঁর হাত ধরে ট্র্যাকটর সে দেশেও পা ফেলার সুযোগ পেল। কেবল রোগীর চিকিৎসা করে নয়, এই ট্র্যাকটর অন্য চিকিৎসকদের কাছে বিক্রি করে পিতা-পুত্র দুজনেই প্রচুর পয়সা উপার্জন করতে থাকলেন। এগুলো বেশ উঁচু দামেই বিক্রি হত তার কারণ পিতা-পুত্রের মতে এই দণ্ড এক বিশেষ ধরনের সঙ্কর ধাতু দিয়ে তৈরি হত।

বেশ ভালই চলছিল। কিন্তু সমাজে দুষ্ট লোকের অভাব নেই, যাদের কাজই হল কেউ কিছু ভাল কাজ করলে তার খুঁত বার করা। এরকমই একজন জন হেগার্থ, ইংরেজ চিকিৎসক। তাঁর কাছে গোটা ব্যাপারটা অবাস্তব, যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক বলেই মনে হল। অতএব পরীক্ষা চালানো দরকার। তিনি সহকর্মীদের বললেন, কয়েকটা নকল ট্র্যাকটর বানাও, নকল এই অর্থে যে এইসব ট্র্যাকটর ওই বিশেষ ধরনের সঙ্কর ধাতু দিয়ে তৈরি নয়, এমনকি কতকগুলো তৈরি হল হাড়, সেলেট পাথরের, এমনকি রঙ করা ধূমপানের পাইপ দিয়ে— যেগুলোর একটাও বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়। এই নকল ট্র্যাকটর ব্যাপারটা রোগীদের কাছে তো বটেই এমনকি দু-একজন ছাড়া সবার কাছে গোপন রাখা হল।

১৭৯৯ সালে পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেওয়া হল ইংল্যান্ডের বাথ মিনারেল ওয়াটার হসপিটাল ও ব্রিস্টল চিকিৎসা কেন্দ্রকে। বিভিন্ন রকমের ব্যথায় যে সব রোগী ভুগছিলেন তাঁদের বেশ কিছুর ওপর প্রয়োগ করা হল আসল পারকিনসের ট্র্যাকটর। আর কিছু রোগীর ওপর প্রয়োগ করা হল নকল ট্র্যাকটর। কোন্ রোগীকে আসল, আর কাকে নকল ট্র্যাকটর প্রয়োগ করা হল, তার হিসেব রাখা হল। আশ্চর্যজনকভাবে সবার ক্ষেত্রেই ফল এক— সবাই ব্যথার উপশম বোধ করলেন। পারকিনসের বিদ্যুৎবাহিত বিজ্ঞানভিত্তির দাবি ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে শুরু করল। হেগার্থের সিদ্ধান্ত হল— 'কেবলমাত্র কল্পনা রোগের ওপর প্রভূত শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।' হেগার্থ আরও পরীক্ষা চালালেন এবং প্রমাণিত হল পারকিনসের ট্র্যাকটর হাতুড়েগিরি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এভাবে প্রকৃত রোগ সারে না, রোগীর রোগ সারাটা মনে। এই ব্যাপারটাই এখন ইংরেজিতে Placebo বলেই পরিচিত। একে বাংলায় 'মনোতোষ' বলে অভিহিত করা বর্তমান প্রবন্ধকারের সিদ্ধান্ত।

Placebo শব্দটার উৎপত্তি এক ল্যাটিন শব্দ থেকে যার বাংলা মানে করলে দাঁড়ায় 'আমি সন্তুষ্ট করব।' ওয়েবস্টার'স সেভেনথ নিউ কলেজিয়েট ডিকশনারি বলছে, 'An inert or innocuous medication given esp. to satisfy the patient. b. something tending to soothe or gratify.'। কলিনস কোবিল্ড ডিকশনারি আর একটু সবিস্তার করে বলছে– 'Placebo is a harmless inactive substance that a doctor gives to a patient instead of a drug. Placebos are used when testing new drugs or when a patient has imagined their illness.।' প্ল্যাসিবো এফেক্ট সম্পর্কে লিখছে– 'The placebo effect is the fact that some patients' health improves after taking what they believe is an

effective drug but which is in fact only a placebo.'। আরও জানাচ্ছে, 'প্ল্যাসিবো এফেক্ট ক্যান বি আন্ডারস্টুড অনলি ইফ উই অ্যাকনলেজ দ্য ইউনিটি অভ মাইন্ড অ্যান্ড বডি।'

সাহিত্যিকেরা এমন কি চসারও Placebo শব্দটা ব্যবহার করেছেন; সেখানে মানেটা দাঁড়ায় 'যে কথা বলা হল তার মধ্যে মোটেই আন্তরিকতার স্পর্শ নেই যদিও তা শ্রোতার অনেকটাই সন্তোষ বিধান করে।' চিকিৎসা শাস্ত্রে আজকের অর্থে Placebo শব্দের ব্যবহার শুরু হয় ১৮৩২ সাল থেকে। এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এটাকে জনসমক্ষে প্রথম আনার কৃতিত্ব অবশ্যই জন হেগার্থের।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে একটা ভুল ধারণা হতে পারে যে, প্ল্যাসিবোর কারিগরি কেবল ব্যথার উপশমেই। তা মোটেই নয়। অনেক রোগেই প্ল্যাসিবোর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্ল্যাসিবো যে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এটা পুরোপুরি অবহেলার বস্তু নয়, এটা বুঝতে গবেষকদের অসুবিধা হল না। সেজন্যই এর পেছনে আরো সময় দিয়ে এর গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা শুরু হল। এই প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হল কারণ অনুসন্ধান।

মানুষের ক্ষেত্রেও প্ল্যাসিবো যদি 'সৃষ্টি হওয়া অবস্থা' হয় তবে তার কার্যকারিতার কারণ হিসাবে বলা হল যে মানুষ এক-একটা জিনিসের (ডাক্তার, পিল খাওয়া) সঙ্গে তার রোগ ভাল হওয়াটার এক অনুষঙ্গ সৃষ্টি করে নিয়েছে। এজন্যই কোনো ওষুধের উপাদান-শূন্য চিনির পিল খেলেও রোগী সুস্থ বোধ করে।

কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে রাশিয়ান শরীর বিজ্ঞানী ইভান পেত্রোভিচ পাভলভের কুকুর নিয়ে 'কন্ডিশনিং রিফ্লেক্স' পরীক্ষার প্রসঙ্গ টেনে তাকে কারণ হিসাবে পেশ করেন। এটাকে 'সৃষ্টি হওয়া অবস্থা' তত্ত্ব বলেন। এটা ছাড়াও আর এক তত্ত্ব হল— 'প্রত্যাশার তত্ত্ব'। কোনো পথ্যের কাছে রোগীর যদি প্রত্যাশা থাকে যে তার রোগ সারবে তবে তাতে রোগ সারতে পারে। 'প্রত্যাশার তত্ত্ব'র সমর্থনে অনেক তথ্য সংগৃহীত হলেও এ তত্ত্ব নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা এখনও সৃষ্টি হয় নি। এর কারণ বোধ হয় এটাই যে, আমাদের প্রত্যাশা ও আমাদের শরীরের জটিল অবস্থাজনিত প্রতিক্রিয়া (acute phase response) পরস্পরের ওপর ক্রিয়া করে।

এ দুটো ছাড়াও হয়ত আরো কারণ আবিষ্কার হতে পারে, তার একটা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা একমত যে, প্ল্যাসিবো বা মনোতোষের একটা ভূমিকা আছে। আর সেজন্যই এই এর প্রভাব কীভাবে বৃদ্ধি পায় সে বিষয়টাও তাদের অনুসন্ধানের বিষয়। যেমন দেখা যায় পিল খাওয়ানোর চেয়ে একই ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে শরীরে প্রবেশ করালে রোগী বেশি সুস্থ বোধ করে। উদ্বেগ উপশমে সবুজ রঙের পিলের প্ল্যাসিবোর ভূমিকা বেশি, বিষাদগ্রস্ততার ক্ষেত্রে হলুদ রঙের, নার্স ওষুধ খাওয়ানোর চেয়ে ডাক্তারের, টি-শার্ট পরা ডাক্তারের চেয়ে সাদা কোট পরা, ছোট ট্যাবলেটের চেয়ে বড়র।

এ উদাহরণ সাধারণ রোগীদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য কারণ প্ল্যাসিবোর প্রভাব অনেকটাই নির্ভর করে রোগীর মানসিক গঠন, বিশ্বাসভিত্তি, জীবনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কতকগুলো জিনিসের ওপর। সব মানুষের ওপর প্রভাব সমান হয় না।

ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও প্ল্যাসিবো

আধুনিক বিজ্ঞানের পথ অনুসরণ করে গবেষণাগারে কোনো নতুন ওষুধ আবিষ্কার হবার পর থেকে বাজারে পুরোপুরি বিক্রি হওয়ার জন্য পৌঁছানো, এই পথটা মোটেই মসৃণ নয়। বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়ে প্রতিটি স্তর সাফল্যের সঙ্গে ডিঙোতে পারলে তবেই সেই ওষুধ ছাড়পত্র পায়। এই বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষার নাম ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। এই ট্রায়াল কেবল খুব সময়সাপেক্ষ নয়, প্রচুর ব্যয়বহুলও বটে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের আবিষ্কর্তা জিমস লিন্ড বলে এক জাহাজের চিকিৎসক, যিনি ১৭৪৭ সালে মানুষের রক্তে ভাইটামিন 'সি'-র ঘাটতির চিকিৎসা করতে গিয়ে এই ট্রায়াল উদ্ভাবন করেন।

প্ল্যাসিবোর ব্যবহার বেশিরভাগ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের অংশ। এর উদ্দেশ্য ওষুধ বা চিকিৎসা পদ্ধতির কার্যকারিতার মূল্যায়ন। এর প্রভাব সঠিক নিরূপণ করার জন্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালকে কতখানি উন্নত করা যায় সে ব্যাপারেও গবেষণা চালানো হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে, কোনটা নকল, কোনটা আসল ওষুধ সেটা রোগীদের বুঝতে দেওয়া হয় না। অর্থাৎ এ ব্যাপারে রোগীরা অন্ধ, সেজন্য এটাকে অন্ধীকৃত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল (blinded clinical trial) বলা হয়। কেবল রোগীরা নয়, ব্যাপারটাকে গোপন রাখা হয় যারা সরাসরি ট্রায়াল সংঘটিত করে তাদের কাছেও। এইসব ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহার, মুখ

চোখের ভঙ্গিতে অনেক সময় আসল/নকলের পার্থক্যটা রোগীদের বোধগম্য হয়ে যায়। এই ঝুঁকিটাও নিতে পারা যায় না। একদল লোককে যখন অন্ধকারে রাখা হয় তখন সেটা অন্ধীকৃত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আর দু-দল লোককে যখন অন্ধকারে রাখা হচ্ছে তখন সে ট্রায়ালকে বলা হয় দ্বিগুণ অন্ধ।

ট্রায়ালকে আরো ত্রুটিহীন করার প্রয়াসে ট্রায়ালের অন্তর্ভুক্ত সকল রোগীকে সম পরিস্থিতির মধ্যে রাখা হয়। কেবল ওষুধগুলোকে দেখতে একইরকম তা নয়, ট্রায়াল সঙ্ঘটিত হয় একই জায়গায়, সব রোগীকে সম পরিচর্যার মধ্যে রেখে। এটা না হলে ট্রায়ালের ওপর যে প্রভাব পড়ে সেটাকে অনির্দিষ্ট প্রভাব (non-specific effects) বলা হয়।

কোনো ট্রায়ালকে ত্রুটিহীন করতে গেলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি মোটামুটি এরকমঃ ১) যারা ওষুধের উপাদান যুক্ত ওষুধ নিচ্ছে (treatment group) আর যারা নিচ্ছে উপাদানবিহীন [control group- (নিয়ন্ত্রণাধীন)]। এই দুই দলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। ২) দুই দলেরই অধিক সংখ্যক রোগী। ৩) কোন দলে কে থাকবে, তা যথেচ্ছভাবে ঠিক করা। ৪) প্ল্যাসিবোর প্রয়োগ কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণাধীন দলের রোগীদের দেওয়া। ৫) দুই দলকেই সার্বিকভাবে সম পরিস্থিতির মধ্যে রাখা। ৬) রোগী ও ডাক্তার উভয় দলকেই অন্ধকারে (double blind) রাখা।

ওপরের পদক্ষেপগুলি মেনে ট্রায়ালকে বিজ্ঞানসম্মত বলেই ধরা হয়।

যে ট্রায়াল প্ল্যাসিবো নিয়ন্ত্রিত, সে ট্রায়ালকে ঋণাত্মক ধরনের বলা হয়, আর যে ট্রায়ালের নিয়ন্ত্রণ পূর্ব পরীক্ষিত চিকিৎসা পদ্ধতি সেটা হল ধণাত্মক শ্রেণীভুক্ত।

আকুপাংচার ও প্ল্যাসিবো

যদিও চীন দেশে উদ্ভাবিত বলে প্রচারিত আকুপাংচার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে ৫০০০ বছর আগে মধ্য ইউরোপে। সে এক পৃথক কাহিনী। চীন অবশ্য দাবি করে, এর উদ্ভাবনা সে দেশেই। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীকে কোনো ওষুধ খাওয়ানো হয় না।

এই চিকিৎসা পদ্ধতির মূলে যে বিশ্বাস কাজ করে সেটা হল, আমাদের শরীরের মধ্য দিয়ে জৈব জীবনের বিকাশস্বরূপ এক শক্তি (ch'i)। শরীরের মধ্যস্থিত বিভিন্ন পরিবাহী নালীর (যেগুলোকে meridians বলা হল) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। আমাদের অসুস্থতার কারণ ch'i-র প্রবাহের অসাম্য অথবা meridians-র মধ্যে প্রবাহের বাধা পাওয়া। নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় ছুঁচ ফুটিয়ে এই প্রবাহের অসাম্য দূর করা ও বাধাকে দূর করাই আকুপাংচারের মূল উদ্দেশ্য।

যদিও ch'i বা meridians-র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি, তবু এই চিকিৎসায় মানুষ উপকার পাচ্ছে বলে মনোতোষের ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতেই হয়। এ মনোতোষের পরীক্ষায় হয় control group-র রোগীদের ছুঁচ ফোটানোই হয় না অথবা আকুপাংচারের নিয়ম মেনে যত গভীরে ছুঁচ ফোটানো উচিত সেটা না করে সামান্য গভীরতা পর্যন্ত প্রবেশ করানো হয়। এই মনোতোষ পরীক্ষায় দ্বিগুণ অন্ধতার অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য কেবলমাত্র নতুন ধরনের ছুঁচ ফোটানোর সরঞ্জামের উদ্ভাবনা নয়, আরো অনেক কিছুকে নিয়ে সৃষ্টিমূলক বেশ কিছু চিন্তার পরিচয় দিতে হয়েছে বহু গবেষককে।

আকুপাংচারের বিজ্ঞান ভিত্তি নিয়ে ১৯৭৯ সালে এক সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO। ২০০৩ সালে এ সংক্রান্ত প্রকাশিত সব গবেষণাপত্রের ফলাফল বিশ্লেষণ করে আর এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করে। তাতে আকুপাংচার প্ল্যাসিবো-মুক্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয়, এই রিপোর্ট প্রশংসা পাওয়া তো দূরের কথা হু-র মতো প্রতিষ্ঠান এরকম অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে কী করে বিশ্লেষণ করল, সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এমনকি হু-র ভাগ্যে এ অভিধাও জুটল, আধুনিক চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের অনুসন্ধান পুরোপুরি বিজ্ঞানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও বিকল্প চিকিৎসার ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে মাথা নত করে। এত করেও আকুপাংচারের বিজ্ঞানভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় নি এবং প্ল্যাসিবোই জয়ী হয়েছে। অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী একে অবশ্য কোয়াসি সায়েন্স বলছেন।

হোমিওপ্যাথি ও প্ল্যাসিবো

জার্মানির চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান (আসল উচ্চারণ হাইনেমান) অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যে অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে তার জনপ্রিয়তা তো কমেই নি, কোনো কোনো স্থানে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহেবদের কথা বললে আমাদের বিশ্বাস আরো পাকাপোক্ত হয়। কয়েক বছর আগের পরিসংখ্যান বলছে,

হোমিওপ্যাথি ইউরোপে প্রভূত জনপ্রিয়; ফ্রান্সের ১৬, বেলজিয়ামের ৫০ শতাংশ মানুষ রোগ সারাতে এর শরণাপন্ন হন। যদিও সাহেবদের দেশ নয়, ভারতে এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত ৩ লক্ষ চিকিৎসক, ১৮২টি কলেজ এবং ৩০০ হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল আছে। 'ট্র্যাকটর'-এর গুণে জর্জ ওয়াশিংটন যেমন মজেছিলেন, তেমনি হোমিওপ্যাথি পেয়েছিল তার এক অন্ধ ভক্ত ষষ্ঠ জর্জের মধ্যে।

হ্যানিম্যান যে বিশ্বাসের ওপর তাঁর তত্ত্বকে খাড়া করিয়েছেন তার মূল কথা, 'যেটা রোগের কারণ, সেটাই রোগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা' (like cures like)। এর হাত ধরেই সমধর্মীর সূত্র (Law of similar)। অনেকটা ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়ায়, বিচুটি পাতায় গা চুলকায়, চর্মরোগেও গা চুলকায়। অতএব বিচুটি পাতার রসই চর্মরোগের ওষুধ হতে পারে। তার সঙ্গে যোগ হল আর এক সূত্র-- 'অধিকতর তরলীকরণ'। বিচুটি পাতা কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর পাতাগুলো ফেলে দিলে যে রস থাকে সেটাই হল ওষুধের প্রকৃত জন্মদাত্রী (mother tincture)। হ্যানিম্যানের সূত্র অনুসারে রসটাকে বারংবার জল অথবা অ্যালকোহল দিয়ে অধিকতর তরলীকরণ করতেই থাকলে যত তরলীকৃত হবে তত এই তরল বর্দ্ধিত শক্তি (potency) পাবে অর্থাৎ রোগ নিরাময়ে সে তত বেশি কার্যকর হয়ে উঠবে। ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এই দ্রাবণকে ঝাঁকুনি পেতে দেখে হ্যানিম্যানের পর্যবেক্ষণ হল যে, দ্রাবণ প্রস্তুতিতে ঝাঁকুনির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রস্তুতকালে যত ভালভাবে ঝাঁকানো যায় ওষুধের গুণমান তত বৃদ্ধি হয়।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল সাধারণত যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ ডাক্তাররা রোগীকে দেন সেটা তরলীকরণের যে স্তরের দ্রাবণ তাতে প্রকৃত জন্মদাত্রী নামমাত্রও উপস্থিত থাকে না। সেটা নিছক জল ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ জল মেশাবার যে পদ্ধতি তাতে ওই মাত্রায় তরলীকরণ করতে গেলে গোটা দশেক পৃথিবীর সমস্ত জলেও কুলোবে না।

এখন উপায়? যার মধ্যে বিজ্ঞানের 'ব' নেই তাকে বিজ্ঞান বলে তো চালাতে হবে। আসরে নামলেন বেনেভিস্টে বলে ফ্রান্সের রেসের মাঠের এক প্রাক্তন গাড়ি চালক, যিনি পরবর্তীকালে চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি গবেষণাগারে প্রমাণ করেছেন বলে দাবি করলেন যে, জলের স্মৃতিশক্তি আছে এবং এই স্মৃতিশক্তির শারীরিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। তিনি এখানেই থেমে থাকেন নি। 'নেচার' পত্রিকায় (জুন ১৯৮৮) তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করে ফেললেন। 'নেচার' তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন বটে তবে শেষে 'এর বিষয়বস্তু নিয়ে তাদের যে কোনো দায় নেই' (disclaimer) লিখে দিলেন। এরকমভাবে 'নেচার' এর আগে ১৯৭৪ সালে ইউরি গেলারের (রাশিয়ান জাদুকর যিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করতেন) কর্মকাণ্ড নিয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। বেনেভিস্টের দাবি কীভাবে পপাত ধরণীতলে হল তার বিবরণ দিতে গেলে সেটা বিমল মিত্রের এক উপন্যাস হয়ে যাবে।

কেউ আবার এক হাসপাতালের ৬৫০০ রোগীর ওপর ৬ বছর ধরে হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রয়োগ করে দেখলেন যে ৭০ শতাংশ রোগী উপকৃত। এ পরীক্ষায় মস্ত বড় ফাঁক থেকে গেল, কারণ এখানে control group বলে কিছু নেই অর্থাৎ প্ল্যাসিবোর পরীক্ষাই করা হল না। এই ৭০ শতাংশ রোগী হোমিওপ্যাথি ওষুধ গ্রহণ না করলেও ভাল হত কি না তার পরীক্ষাই ত হল না।

হোমিওপ্যাথির বিজ্ঞানভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা যাঁরা করছেন তাঁরা বিজ্ঞানের এক বিরাট উপকার করে বসেছেন এবং প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে হোমিওপ্যাথি প্ল্যাসিবো ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এটাই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। এবং এর মধ্যে দ্রব্যগুণ বলে কিছুই নেই।

অবশ্য আয়ুর্বেদের ব্যাপারটা একটু আলাদা।

আয়ুর্বেদ ও প্ল্যাসিবো

হায়দ্রাবাদের প্রখ্যাত জাতীয় গবেষণাগার সেন্টার ফর সেলিউলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজির বিজ্ঞানীরা ৭ বছর ধরে গবেষণা করে সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তে আসেন, আয়ুর্বেদের মূল ব্যাপারটা পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক। লক্ষ্য করুন বলা হচ্ছে, **মূল ব্যাপারটা বিজ্ঞানভিত্তিক**। বলা হয় নি যে পদ্ধতিতে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা চলছে, যেসব ওষুধ বাজারে বিক্রি হচ্ছে সেগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক মূল ব্যাপারটা বিজ্ঞানসম্মত তো বটেই। প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন, আদিতম ওষুধের ভিত্তি গাছগাছড়া।

আবার পরবর্তীকালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে— একটা গাছের পাতা বা শিকড়ের মধ্যে অনেক উপাদান থাকে। এর মধ্যে এক বা একাধিক উপাদানই কেবল কোনো নির্দিষ্ট রোগ নিরাময়ে কার্যকর, গোটা পাতা বা শিকড় নয়। এই কার্যকর উপাদানকে পৃথক করে তার থেকে ওষুধ তৈরি করাটাই প্রকৃত বিজ্ঞান। গোটা পাতা বা শিকড় ওষুধ হিসাবে গ্রহণ করা ক্ষতিকে আহ্বান করে আনার সামিল।

বিজ্ঞানের ঘাটতি ধামাচাপা দেবার জন্য আয়ুর্বেদ ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অনেক ঢিলেঢালা। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ওষুধের মতো কড়াকড়ি নেই। অন্য ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যদি বিজ্ঞানভিত্তিক বলে মেনে নিই তবে এ ক্ষেত্রে অবিজ্ঞানকে কেন প্রশ্রয়? কেন এমনটা হবে? মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এভাবে কেন চলতে দেওয়া হবে? কারণটা খুব সহজ; বাদল সরকারকে উদ্ধৃত করে বলতে হয়— 'যুক্তির ভয়। বুঝলে যুক্তি আসে। যুক্তি এলে তাকে মানতে হয়। মানলে যুক্তি এগোয়। সিদ্ধান্তের দিকে এগোয়। সিদ্ধান্তকে মানুষ ভয় করে।' তবু আয়ুর্বেদ ওষুধ এত লোক খাচ্ছেন এবং বেশ কিছু লোক উপকারও পাচ্ছেন। এখানেই মনোতোষের প্রভাব। এই প্ল্যাসিবোর জ্বলন্ত উদাহরণ পতঞ্জলির বিজ্ঞাপনগুলো। বিজ্ঞাপন জগতের প্রচলিত রীতি আমরা দেখতে পাই জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের দিয়ে দ্রব্যের গুণগান করানো। কিন্তু রামদেব স্বয়ং এই ভূমিকায়। পতঞ্জলির বিপণনের অভিভাবকদের বোকা ভাববেন না। এটা পুরোদস্তুর পাকা মাথার কাজ। আয়ুর্বেদ ওষুধের সম্ভাব্য ব্যবহারকারী (target group) যারা, তাদের কাছে যুক্তির চেয়ে একজন ধর্মগুরুর কথা অনেক বেশি মূল্যবান। এ বিজ্ঞাপনে অমিতাভ বচ্চনের চেয়ে রামদেব অনেক বেশি আবেদন সৃষ্টি করবে। করবে দু ভাবে— ১) পণ্যের বিক্রি বাড়বে, ২) প্ল্যাসিবোর প্রভাব অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।

Nocebo প্রভাব

Nocebo হল প্ল্যাসিবোর বিপরীত। Placebo-র অর্থ হল I will please আর Nocebo হল I will harm— আমি ক্ষতি করব। যে ওষুধে রোগীর বিশ্বাস নেই সে ওষুধ খেয়ে রোগী মনে করতে শুরু করলেন তাঁর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাও ক্ষতিকর এবং এটার প্রভাবের তীব্রতা মাপার পদ্ধতি আছে। Placebo-র একটা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বাংলা প্রতিশব্দ ভাবা গিয়েছিল। Nocebo-র প্রতিশব্দ এখনও অধরা রইল।

প্ল্যাসিবো নিয়ে কয়েকটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে এ আলোচনা শেষ করব ঃ (ক) আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র মেনে যে সমস্ত ওষুধ প্রয়োগ করে রোগ সারানো হয় তার মধ্যেও প্ল্যাসিবোর কিছুটা খেল থাকতে পারে। অর্থাৎ এমনও হয় একটা ওষুধ তার রাসায়নিক গুণেই কিছুটা রোগ সারাল; আবার কিছুটা সারল প্ল্যাসিবোর প্রভাবে। (খ) আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রসম্মত ওষুধের গুণে খানিকটা রোগ সারল খানিকটা প্ল্যাসিবোতে। কিন্তু প্ল্যাসিবোর কোনো ক্ষমতাই নেই কোনো রোগকে পুরোপুরি সারানোর। (গ) গবেষণায় এটাও দেখা গেল যে প্ল্যাসিবোর প্রভাব কেবল মনে নয়, শারীরবৃত্তেও পরিবর্তন ঘটায়। (ঘ) মনে হতে পারে প্ল্যাসিবো খারাপ কিছু করে না। এটাও ঠিক নয়। এমন হতে পারে প্ল্যাসিবোর প্রভাবে প্রথম দিকে রোগটার অনেকটাই উপশম হল। কিন্তু এরপরেও চিকিৎসা শাস্ত্র মেনে আরো কিছু করার বাকি। কারণ রোগটা তো সারে নি, অথচ সেরে গেছে এই অনুভূতির প্রভাবে আর বাকি চিকিৎসার কাজটা রোগী করল না। ইতিমধ্যে রোগটা আরও খারাপ দিকে মোড় নিল। (ঙ) প্ল্যাসিবোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এমন মনে করার কোনো কারণ নেই, ক্ষেত্রবিশেষে এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মারাত্মক। (চ) ওষুধের ক্ষেত্রে প্ল্যাসিবোর ব্যাপারটা যতটা সোজাসাপটা, ওষুধ ব্যবহার না করে মানসিক চিকিৎসার যে সব প্রচলিত পদ্ধতি আছে সেখানে প্ল্যাসিবোর প্রভাব নিয়ে জ্ঞান যেমন সীমিত তেমনি এর হাতেনাতে প্রয়োগও খুব কঠিন। (ছ) চিকিৎসা শাস্ত্র সংক্রান্ত কিছু বিধি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল হেলসিঙ্কি ঘোষণা ১৯৬৪ সালে যার ২৯নং অনুচ্ছেদ পুরোটাই প্ল্যাসিবো নিয়ে। এই অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত অর্থকে আরো পরিষ্কার করল চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠান ২০০২ সালে।

তথ্যসূত্র ঃ ১) Simon Singh and Edzard Ernst, Trick or Treatment: Alternative Medicine on Trial. Transworld Publishers, London, First Edition, (Corgi Books) 2009. ২) অন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত।

উমা

সংগঠন সংবাদ

বাংলাদেশের অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের বিজ্ঞান সংগঠন অনুসন্ধিৎসু চক্রের ৭ম জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন উপলক্ষে 'নতুন প্রজন্মের উপর স্মার্টফোনের প্রভাব' শীর্ষক এক আলোচনা গত ৭ অক্টোবর, ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্দকার মোকাররম হোসেন ভবনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অনুসন্ধিৎসু চক্রের আজীবন সদস্য আজহারুল হক।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আলি আসগর তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্মার্টফোন স্থানকে ছোট করে দিয়েছে। এটা নির্ভর করে বুদ্ধির বিকাশ, ব্যক্তিত্বের উপর। জ্ঞান অর্জনের জন্য যে একাকিত্ব দরকার, যা স্মার্ট ফোন কেড়ে নিচ্ছে। এই সময়ে স্মার্টফোন নতুন প্রজন্মকে যেমন সংযুক্ত করছে তেমনি বিবেক বিবেচনাহীন ব্যবহারে সময়-সম্পদের অপচয়ও বাড়ছে। নবীনদের লক্ষ্য হোক প্রজ্ঞা অর্জন। শুধু প্রযুক্তির নেশায় না ডুবে বই পড়াকেও প্রাধান্য দিতে হবে। এখন চোখ-কান দুটোই স্মার্টফোনে আটকে যাচ্ছে। এটা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের অনারারি প্রফেসর অধ্যাপক খন্দকার সিদ্দিক-ই-রবানী বলেন, স্মার্টফোন ফেসবুকে আমরা সংযুক্ত যেমন হচ্ছি তেমনি পথও হারাচ্ছে অনেকে। প্রযুক্তির যুগে এখন তাই ভারসাম্য রক্ষা করাটা জরুরি। যার বিনয় নেই তার জ্ঞান নেই। পাশ্চাত্যকে বেদবাক্যের মতো মানার কারণ নেই। আমাদের নিজেদের যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে হবে। নারীকে রাস্তায় ফেলে নির্মমভাবে কোপানোর প্রসঙ্গ টেনে প্রফেসর রব্বানী বলেন, প্রযুক্তিতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তবে মানবিকতায় আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। এমন সংকট থেকে মুক্তির জন্য নৈতিকতার ভিত্তি মজবুত হওয়া উচিত জানিয়ে তিনি বলেন, স্মার্টফোনের ব্যাপারে নৈতিকতা গড়ার দায়িত্ব পরিবারের, সমাজের।

প্রকৌশলী মো. সাজেদুল হোসেন সরকার তাঁর বক্তব্যে বলেন, মোবাইল ফোন একধরনের ভয়াবহ ইলেকট্রোপলিউশন সৃষ্টি করছে। যেগুলো বেশি রেডিয়েশন বিকিরণ করে, সেগুলো আমাদের বাজারে বেশি পাওয়া যায়। এই বিকিরণ মানবস্বাস্থ্যের নীরব ঘাতক। টাওয়ার নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ উচ্চতা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তা মোবাইল অপারেটররা মানছে না।

সুন্দরবনের অনতিদূরে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন না করার আহ্বান অনুসন্ধিৎসু চক্রের

অনুসন্ধিৎসু চক্রের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আমানুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আরাফত রহমান ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬, এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রক্ষাবর্ম সুন্দরবনের অনতিদূরে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন না করতে সরকারের/সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, বাংলাদেশে সরকার সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনের অনতিদূরে একটি কয়লা ভিত্তিক ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বসাতে যাচ্ছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে যৌথ মালিকানায় বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও ভারতের রাষ্ট্রীয় কোম্পানি এনটিপিসি-র (ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি)। রামপালের জন্য প্রতি বছর ৪৭ লাখ টন কয়লা, চুনাপাথর ইত্যাদি সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে পরিবহন করতে হবে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে সৃষ্ট বিপুল পরিমাণ উষ্ণ ও দূষিত পানি সংশ্লিষ্ট বাস্তুসংস্থানে যুক্ত হলে এবং আশেপাশে বহু শিল্প-কারখানা গড়ে উঠলে তা পৃথিবীর এই একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের সংবেদনশীল প্রতিবেশ ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকি আরও বাড়িয়েই তুলবে। বিজ্ঞান সংগঠন অনুসন্ধিৎসু চক্র দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে সুন্দরবন থেকে দূরে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

বার্তাপ্রেরক এহতেশামুল কবির, সহ সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি, অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান সংগঠন

● '**বিজ্ঞান দরবার**'-এর মুখপত্র '**বিজ্ঞান অন্বেষক**'-এর ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে ১৩ নভেম্বর (রবিবার) ২০১৬ নদীয়ার মোহনপুরে কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশনের সন্নিকটে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য মহান বিজ্ঞানী অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রতিষ্ঠিত রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ গণ-বিজ্ঞান সংগঠনগুলির সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের সমৃদ্ধ করুন। যোগাযোগঃ জয়দেব দে (৯৪৭৪৩৩০০৯২), বিবর্তন ভট্টাচার্য (৯৩৩২২৮৩৩৫৬), প্রবীর বসু (৯৮৩০৬৭৬৩৩০)

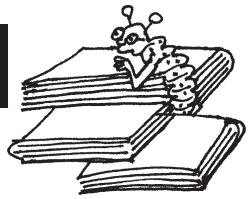

পরিবেশ নিয়ে যুগলবন্দি

ভবেশ দাশ

পরিবেশ ভাবনা

কার্টুনঙ্খ চণ্ডী লাহিড়ী, লেখাঙ্খ প্রতুল মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

বইটা যখন হাতে এল, তখন আমাদের এ রাজ্যে নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। বইটি প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। বিষয়, অবশ্যই 'পরিবেশ ভাবনা'। বইয়ের নামটিও তাই। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কোনো প্রকাশক সংস্থা নয়। সুতরাং এই বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশ চিন্তাই একমাত্র বিষয় হবে, এটাই স্বাভাবিক। বইটির কোনো বিনিময় মূল্যও নেই। অতএব পরিবেশ চিন্তার প্রচার ও প্রসারই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। বইটি হাতে পেয়ে আরও ভালো লাগে, কারণ এর পাতায় পাতায় চণ্ডী লাহিড়ীর কার্টুন আর প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের ছড়া।

পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্রও সেই কথাই বলতে চেয়েছেনঙ্খ 'পরিবেশ চেতনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা কার্টুন ও ছড়াকে বেছে নিয়েছি।' তাঁর বিশ্বাস 'দুই মহান শিল্পীর যুগলবন্দী পরিবেশ সুরক্ষায় বহু মানুষকে আগ্রহী করে তুলবে।' সুসজ্জিত ও সুমুদ্রিত এই বইয়ের ছড়া ও কার্টুন স্কুলের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করবে। চণ্ডী লাহিড়ীর পাতাভরা কার্টুনের পাশে প্রতুল মুখোপাধ্যায় লিখছেনঙ্খ

যত গাছপালা, যত জীব পশুপাখি।
এসো, সবাইকে যত্নে বাঁচিয়ে রাখি।
এঁরা যদি বাঁচে, তবেই আমরা বাঁচি
প্রকৃতি, মানুষ। থাকুক না কাছাকাছি।

এভাবেই জলদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণের নানা ছড়া ছড়িয়ে আছে কার্টুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। নিতান্তই শিশু-কিশোরদের উপযোগী বইটি হাতে পেয়েই নির্বাচনের মতো অনিবার্য ঘটনার মাঝে অনেক প্রশ্ন সামনে এসে গেল।

প্রথমেই মনে হল, এই যে নির্বাচনী মহাযজ্ঞ আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি, রাজনৈতিক দলের মধ্যে অভিযোগ-প্রত্যাভিযোগের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, কে কত ভালো সরকার উপহার দিতে পারে তা নিয়ে যে চাপান-উতোর চলেছে, সেখানে পরিবেশের ভাবনা কতটুকু জায়গা পাচ্ছে? উন্নয়ন তো পরিবেশের বাইরে নয়! পরিবেশকে অস্বীকার করে তো উন্নয়নের সংজ্ঞা তৈরি হতে পারে না! কিন্তু প্রচারে ভাষণে বিজ্ঞাপনে পরিবেশের কথা শোনাই যায় নি। তার চেয়েও বড় কথা, নির্বাচনী ইস্তেহারে যে রাজনৈতিক দলগুলি কর্মসূচি (তাঁদের মতে অবশ্যই জনকল্যাণমূলক) মানুষের সামনে রাখে, সেখানে পরিবেশ নিয়ে কোনো পরিকল্পনা বা আশ্বাসের কথা নেই বললেই চলে। দু-একটি দল একটি দুটি লাইনেই তাদের দায়িত্ব সেরেছে।

একটি সংবাদপত্র তো এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদনে লিখেছিলঙ্খ 'জলাভূমি বাঁচাচ্ছি, বাঁচাব কিংবা বায়ুদূষণ রুখব বা শব্দদূষণ রুখছি, রুখব, গঙ্গায় বর্জ্য ফেলা ঠেকাবই ঠেকাব জাতীয় স্লোগান দলীয় ইস্তাহারে বা কলকাতা টুঁড়েও কোনো ভোটের দেওয়াল লিখনে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। নির্বাচনী মহোৎসবে পরিবেশ এমনই ব্রাত্য। তাকে দূরে রাখার বা ভুলে থাকার ব্যাপারে শাসক-বিরোধীর সুরে বিশেষ তফাত নেই। বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন, পরিবেশনীতি, পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন

সবই আছে, কিন্তু যাঁরা ক্ষমতায় এসে বা বিরোধী আসনে থেকেও এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন, নির্বাচনী মহোৎসব যেন তাঁদের কাছে এক মহা উদাসীনতার কাল। অথচ কলকাতার বায়ুদূষণ ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে। গঙ্গাদূষণেও প্রথম সারিতে এই রাজ্য। পানীয় জলে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের বিষাক্ত রাসায়নিকের দাপট বাড়ছে। উৎসবের মরশুমে শব্দদূষণে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। নিরুপায় হয়ে পরিবেশ কর্মীরা রাজনীতির অঙিনায় নেমে আসবেন এমন কথাও শোনা যায়। আদালতে গ্রিন বেঞ্চের মতো গ্রিন পার্টি গঠনের কথাও শোনা যায়।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদই হিসেব দিচ্ছে, এ রাজ্যে ৫৪টি নিকাশি নালা দিয়ে রোজ কয়েক হাজার কোটি লিটার বর্জ্য গঙ্গায় গিয়ে পড়ছে। সেইসব বর্জ্যের অনেকটাই গঙ্গার জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। গঙ্গার জলের বিপদ তবু বাড়তেই থাকে। নদীর তলার দিকে যে সব ব্যাকটেরিয়া নদীর বাস্তুতন্ত্রের হাল ধরে রাখে, সেইসব ব্যাকটেরিয়াও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ গঙ্গায় জলস্রোতের তীব্রতা কমে যাচ্ছে, বর্জ্য জমা হচ্ছে নদীর তলায়। পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা নদীবিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রই জানিয়েছিলেন, গঙ্গায় জলের অভাবে 'জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তা পুনরুদ্ধারেও সময় লাগে অত্যন্ত বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছুদিন ধরেই গঙ্গা ও তার জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বহু অর্থ খরচ করছে। কিন্তু তা বিশেষ সুফল দিচ্ছে না।

কলকাতা ও হাওড়ার দূষণ দেশের মধ্যে যে প্রথম সারিতে একথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে। তাদের আশঙ্কা, শহরের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের অবনতি নিয়েও। এই দুই শহরের বায়ুদূষণ নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালত যে কমিটি গড়ে দিয়েছিল, সেই কমিটির রিপোর্টেই বলা হয়েছে, কলকাতার বাতাসে (পি এম ১০) ভাসমান ধূলিকণার বার্ষিক গড় স্বাভাবিকের দ্বিগুণ। ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণার (পি এম ২.৫) পরিমাণও স্বাভাবিকের থেকে বেশি। গত তিন বছরে হাওড়ার অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে।

কলকাতা শহরে রাস্তার ওপরেই চলছে গাড়ি সারাইয়ের দোকান, ছড়ানো আছে গাড়ির ব্যাটারি, বিদ্যুতের তার পুড়িয়ে তামা লোহার বার তৈরি হচ্ছে, রয়ে গেছে চামড়ার কারখানা, জমা হচ্ছে বর্জ্য প্লাস্টিক। প্লাস্টিকে আটকে পড়ছে নিকাশি ব্যবস্থা।

পরিবেশকে দুঃসহ করে তোলার এই যে চিত্র, এই সবই তো ধরা পড়েছে চণ্ডীর কার্টুনে। তার সঙ্গে ছড়ার ঝাঁঝ মিলিয়েছেন প্রতুল। যেমনঃ

'যেখানে সেখানে নোংরা ফেলা না'
আমাদের বইয়ে আছে।
বড়রা তো দেখি নোংরা ফেলল আমার বাড়ির কাছে।
ছোটদের বইয়ে যে কথা রয়েছে বড়রা মানছে কই?
তবে কেন মা গো, বার বার বল, 'বই পড়ো, পড়ো বই?'

যেমন একটু আগেই গঙ্গাদূষণে দুর্গতির কথা বলছিলাম, তা নিয়েই ছড়া-কার্টুনের ধাক্কাঃ

শহরের আর শহরতলির,
রাস্তার আর এঁদোগলির,
পশুপাখির যত লাশ
এঁটোকাটা ছাই পাঁশ
ফেলা হয় কোথায় অদ্যাবধি?
গঙ্গা নদী গঙ্গা নদী।

নিয়ম কানুন? অভাব নেই।
দিন চলে যায় না মেনেই।
ফুটবে কবে সবার চোখ?
একসাথে সবাই বলবে কবে
গঙ্গা দূষণ মুক্ত হোক?
বইতে থাকো সে অবধি
গঙ্গা নদী গঙ্গা নদী।

পরিবেশ গবেষণা সংস্থা 'টক্সিক লিঙ্ক' তার সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানিয়েছে, কলকাতার মতো শহরে একাধিক দূষণ সৃষ্টিকারী কারখানা রয়েছে এখনও। এসব কারখানায় বিদ্যুতের তার পুড়িয়ে ভিতর থেকে তামা, লোহার বার তৈরি হয়। সীসা গলানো চলে, জমা হয় প্লাস্টিক বর্জ্য, কোথাও বর্জ্য পোড়ানোর পাশেই চলে ধাতব বর্জ্য ভাঙাও। পরিবেশকর্মীরা বারেবারেই বলছেন, এ ধরনের কারখানা শহরে থাকা উচিত নয়। পর্যায়ক্রমে এগুলি সরিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কাজ হয় নি। এখানেও চণ্ডী আর প্রতুলের মিনতিটুকু কি আবার নতুন করে কান পেতে শুনব?

'শিল্প হবে, দূষণ হবে না'
এমন কথা কেউ কখনও কয়?

দূষণটাকেই বাঁধো এমন করে
কোনো প্রাণই বিপন্ন না হয়।

দিল্লিতে কেজরিওয়াল সরকার রাজধানীর বুকে গাড়ি চলাচলের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জোড় সংখ্যার গাড়ি আর বিজোড় সংখ্যার গাড়ি রাস্তায় বেরোনোর দিন বেঁধে দিয়েছে। এজন্য আইনও হয়েছে। কলকাতা শহরে রাস্তার পরিসরের তুলনায় (গত দশ বছরে কিছু রাস্তা এবং শহর এলাকা প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও) গাড়ির সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। তার ওপর পণ্যবাহী ট্রাক শহরে বা শহরতলি এলাকায় দূষণ বৃদ্ধির একটা বড় কারণ। কলকাতা বলতে গেলে 'ডিজেল-চালিত গাড়ির রাজধানী'। এই শহরে ৯৯ শতাংশ গাড়িই ডিজেল-চালিত। শহর বিষবাষ্পে ভরে যাওয়ার অন্যতম বড় কারণ এই গাড়ির ধোঁয়া।

চণ্ডী-প্রতুলের তাই যুগল নিবেদনঃ

এক বাড়িতেই অনেক গাড়ি।
রাস্তা জুড়ে গাড়ির সারি।
কী করে পথ দেবে পাড়ি?
কী হবে উপায়?
গাড়িগুলোই চড়ুক না হয় মানুষের মাথায়।

কোথাও বলেছেন সরাসরি ঃ

ছুটছে কত গাড়ি
নোংরা ধোঁয়া ছেড়ে।
পথের যত লোকের
পরাণ নিচ্ছে কেড়ে।

দূষণ যে এভাবেই প্রাণ কেড়ে নেয়, সে কথা জোরের সঙ্গে বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। শুধুমাত্র বায়ুদূষণ নয় সব ধরনের দূষণে ২০১২ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। সেই বছরে মোট মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে ২৩ শতাংশের কারণ দূষণ। এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে দূষণের শিকার প্রধানত গরিব মানুষরা। এর মধ্যে শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যাও কম নয়।

কিছুদিন আগেই অভিযোগ উঠেছিল, উত্তর কলকাতার বাগজোলা খালে মানব-বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। আর এই কাজ করছে স্থানীয় পুরসভাই। পুর কর্তৃপক্ষ সে কথা অস্বীকার করলেও মানুষ নিজেদের চোখেই দেখছেন এই ঘটনা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছিল, এই বর্জ্য-ফেলা প্রতিটি গাড়ির বহন ক্ষমতা অন্তত এক হাজার লিটার। প্রশ্ন করলে উত্তর আসে, 'বর্জ্য শোধন করে খালে বা নদীতে ফেলাটা নিয়ম। কিন্তু সব পুরসভায় সেই পরিকাঠামো নেই।'

অথচ পর্ষদের এই অভিনব বইটিতে প্রতুল তো চণ্ডীর ছবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে লিখেছেন ঃ

জলাভূমি দূষণ? এ ভারী অন্যায়
যত জীব বেঁচে থাকে জলে ও ডাঙায়
তাদের আর মানুষের প্রাণ যায় যায়।

আবার মাইক বাজনা পটকায় শুধু শহর এলাকা নয়, মফস্‌সল আর গ্রামগঞ্জও বেশ উত্তপ্ত। ফূর্তি, আনন্দ আর উৎসবের সঙ্গে বাজি-বাজনার তুমুল রোল কানের পর্দা যেন ফাটিয়ে দিচ্ছে। এই অসহ্য শব্দদূষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শব্দপ্রেমীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে, এমন নজিরও আছে একাধিক। দেখতে পাই, শহরের অটোচালকরাও যেন কানফাটানো স্টিরিও না বাজালে অটো চালাতে উৎসাহ পান না। যাত্রী হিসেবে প্রতিবাদ করলে বা বন্ধ করার আবেদনে তারা খুশি হন না মোটেই। অন্যদিকে শব্দতাণ্ডবে যে কোনো উৎসবও এখন আতঙ্ক। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ থেকে তাসা-ব্যান্ড, প্রতিমা বিসর্জনের উল্লাসই বুঝিয়ে দেয় শব্দ এখন ঘাড়-মটকানো ব্রহ্মদৈত্য। চণ্ডীর সঙ্গে তাল দিয়ে প্রতুল লিখছেনঃ

মাইক, বাজনা, পটকা — এসব উৎসবেরই অঙ্গ।
মাত্রাছাড়া শব্দদূষণ ঘটায় রসভঙ্গ।
উৎসবে তো কারও কারও বেড়েই চলে আহ্লাদ।
তাই বলে কেউ হবে না কি মানুষমারা জল্লাদ?

এখন উন্নয়নের একটা অন্যতম শর্ত হয়ে উঠছে সবুজ ধ্বংস করা। গত দশ বছরে কলকাতা ও শহরতলিতে রাস্তা সম্প্রসারণ আর উড়াল সড়কের জন্য বহু গাছ কাটা পড়েছে। তার ওপর শহরের এতটা দূষণ বোধহয় গাছও সইতে পারছে না। ভি আই পি রোড দিয়ে গেলে দেখা যাবে পথের ধারে ৩০-৪০ বছরের পুরনো বড় বড় গাছ শুকিয়ে কাঠ, নিষ্পত্র গাছের শাখা যেন আকাশের দিকে চেয়ে হাহাকার করছে। এমন অভিযোগও শোনা যায়, চক্রান্ত করে গাছগুলোতে বিষপ্রয়োগে এই ধ্বংস চালানো হচ্ছে। গাছ কেটে ফেলার আগে এ যেন মানুষের চোখে ধুলো দেবার চক্রান্ত। সেই সঙ্গে বহুতল বাড়ির আগ্রাসী পরিকল্পনাও

কেড়ে নিচ্ছে গাছের প্রাণ। প্রতুল প্রশ্ন তুলেছেনঃ

এতগুলো গাছ কাটছ কেন?
গাছ সরিয়েই ভবিষ্যতের রাস্তা হবে জেনো।
আমার কিন্তু অন্যরকম মত।
কাটছ না গাছ, কাটছ ভবিষ্যৎ।

নির্বাচনের সময়ে তুঙ্গ প্রচারে পরিবেশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতার কথা বলছিলাম। সম্প্রতি এই রাজ্যে যখন নির্বাচন শেষ হল, তখন জানা গেল, নির্বাচনী প্রচারের কাটআউটে ফেস্টুনে হোর্ডিংয়ে যত প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে, তার পরিমাণ তিন হাজার টনেরও বেশি। অথচ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ আছে প্রচারে প্লাস্টিক অথবা মাটিতে মিশে যায় না, এমন জিনিস ব্যবহার করা যাবে না। ২০০৯ সালে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও তেমন নির্দেশনামা জারি করেছে, কিন্তু কাজ হয় নি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় তৈরি হয়েছিল ৬০০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য।

প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের উদাহরণ দিয়ে প্রতুল বলেছেনঃ

মাটিতে না মিশলেই ব্যাপার ঘোরালো
প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ছেড়ে দেওয়া ভালো।

কিন্তু এ কথা কি বলা যাবে, 'প্রচারে প্লাস্টিক ছেড়ে দেওয়া ভালো'? তাই বলে এত রকমের দূষণক্লিষ্ট জীবনে প্রাণরক্ষার তাগিদে সোজা কথাটা সোজাভাবে বলার হক্‌ও তো ছেড়ে দেওয়া যায় না।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে পর্ষদের সক্ষমতা ও সার্থকতা নিয়ে যত সমালোচনাই থাক, দূষণ সম্পর্কে নবীন প্রজন্মকে সজাগ করার এই প্রয়াসের প্রশংসা করতেই হবে। স্কুলের ছোটছোট ছেলেমেয়েদের হাতে এ বই পড়লে তার ছবি আর ছড়াকে তারা চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে শিখবে। প্রশ্ন করতে শিখবে। যখন তারা পড়বেঃ

গাছের ডালে পাখির বাসা
পাখির বাসায় পাখির ডিম।
গাছটাও নেই পাখিও নেই
ভাবলে করে গা ঝিমঝিম।

এভাবেই তো প্রশ্ন তৈরি হয়। বাড়ে নিজেদের সচেতনতাও। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এই কাজ তাই সদর্থক। আর শিশু-কিশোরদের মন জয় করার জন্য চণ্ডী লাহিড়ী আর প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে যে যুগলবন্দি রচনা করেছে তাকে স্বাগত জানাবে উদ্দিষ্ট পাঠকরাই। বইটির সৌষ্ঠব, আয়তন আর রঙের বিন্যাসে বোঝা যায় এর উপস্থাপনার জন্য পর্ষদ খরচে কার্পণ্য করে নি। কিন্তু বইটি রাজ্যের স্কুলগুলিতে একটা করে দেওয়া সম্ভব হলেও, স্কুলের প্রত্যেক শিশু-কিশোরই কি তা হাতে পাবে? তা বোধহয় সম্ভব নয়। সুতরাং এর একটা সহজ সুলভ সংস্করণ হলেই বা ক্ষতি কি? এমনকি এর ২৯টি ছড়া-ছবি নিয়ে তো তাদের জন্য পকেট-বইও হতে পারে। আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও যদি এই বইকে ঘিরে পরিবেশ ভাবনা ছড়াবার নানা কর্মসূচিতে উৎসাহ দেওয়া যায়, তবে তো কথাই নেই। উদ্দিষ্টের কাছে যথার্থভাবে পৌঁছনোটাও উদ্দেশ্য সাধনের বড় কথা।

মনে পড়ে বেশ কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা। এই রাজ্যেরই এক গ্রামে একটি স্কুলের মাঠে ছায়াছড়ানো একটি বড় গাছ কাটার জন্য এসেছিল একদল নিধনকারী, তখন স্কুলের ছেলেমেয়েরা সকলে গাছটিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'এ গাছ কাটতে হলে আমাদেরও কাটো।'– পিছু হটেছিল নিধনকারীরা।

পর্ষদের এই বইটিই তো আমাদের বলছেঃ

নিয়ম ভাঙার ফলটা যে ভালো নয়–
বোঝে সে যখন প্রকৃতিই আনে
ভীষণ বিপর্যয়।

বিপর্যয় রুখতে এই বইটা প্রকৃতই কাজে লাগুক, এই প্রার্থনা।

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক
স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন **নম্বরঃ** ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 20.00
৩৬ বর্ষ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ ২০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা পেতে যোগাযোগ করুন
দীপক কুন্ডু
২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা - ৭০০০১২
(কলেজ স্ট্রীট কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)
ফোন নং - ৯৮৩০২৩৩৯৫৫

উৎস মানুষ-এর সমস্ত বই-এর জন্য
যোগাযোগ করুন
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩, বেনিয়াটোলা লেন।
কলকাতা -৭০০০০৯
ফোন - ২২৪১-৬৯৮৮

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম
বছরে ৪টি সংখ্যা। চাঁদা ডাক খরচ সহ ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। UBI-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা অন্য যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা জমা দিন UBI কলেজ স্ট্রীট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—
United Bank of India, College Street Branch, Kolkata - 700073. UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. UTBI0COLI08
ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।
ওয়েবসাইট ঃ **www.utsamanush.com**
ই-মেল ঃ **utsamanush1980@gmail.com**

পুস্তক তালিকা

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (দুই খণ্ড একত্রে সংকলিত)	২০০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১০০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন সংকলন	৫০.০০
যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫০.০০
আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান সংকলন	৫০.০০
আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
প্রতিরোধঙ্খ অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক নিরঞ্জন ধর	১০০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি	৬০.০০
প্রমিথিউসের পথে	৪০.০০
লেখালিখি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি সংকলকঙ্খ প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৪০.০০
মূল্যবোধ সংকলন	৫০.০০

প্রাপ্তিস্থানঙ্খ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প ১৮বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৩১, থীমা ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রীট।

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদকঙ্খ সমীরকুমার ঘোষ